গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- শোক সংবাদ / পৃ. ২
- বহুমত - বিতর্ক ,.....ঐক্যমত, এই পথই সংগঠনের প্রাণশক্তি / পৃ. ৩
- রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে / পৃ. ৭
- ...দেশজননী বিলকিসের লড়াইকে কুর্নিশ/ পৃ. ৯
- Fact-Finding Report by Darjeeling/ পৃ.১১
- নির্ভীক সংবাদমাধ্যমে সন্ত্রস্ত শাসককুল / পৃ. ১২
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (৫ম কিস্তি)/ পৃ. ১৪
- ডিপিডিপি'র জালে আরটিআই / পৃ. ১৬
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৭-১৯
- রিপোর্ট / পৃ. ১৯-২৮

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

আগামী দিন প্রতিবাদেরও

বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তুপের উপর শেষ পর্যন্ত রামমন্দির-ই তৈরী হল। তৈরী হল ভারতের সংবিধান এবং ধর্ম নিরেপেক্ষতার মৃতদেহের উপর দিয়ে। দেশের প্রধানমন্ত্রী রামমন্দির উদ্বোধন করে বলেছেন, রামমন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশে 'নয়া কাল বা নুতন যুগের সূচনা হল।

শুধু ধর্ম নিরপেক্ষতাই নয় ধর্মাচারণের অধিকার এবং ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকারের কথাও বলেছে ভারতীয় সংবিধান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে 'নয়া কাল'-এর কথা বলেছেন, এটা স্পষ্ট, আগামী ভারত চলবে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু ভারতবাসীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে। বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির বানানোই নয় শুধু, ধর্মস্থান আইনকে লঙ্ঘন করে কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদকে কেন্দ্র করে ফের গন্ডগোল শুরু করেছে ওরা, আদালত সহ ভারত রাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সি এ এ-২০১৯-কে হিমঘর থেকে বের করে এনে মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার হুমকি দিচ্ছে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে চাইছে। হিজাব, আজান, গো-মাংসে নিষেধাজ্ঞার-পর-নিষেধজ্ঞা চাপিয়ে মুসলমানদের 'অপর' বানিয়ে 'নয়া কাল-এর হাত ধরে হয়তো আসবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। ধ্বংস করা হবে বহুত্ব—।

কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের মামলায় আশ্চার্য্যজনক আদালতের রায়ে এটা স্পষ্ট যে, বিচার ব্যবস্থার অনেকটাই ইতিমধ্যে নাগপুরের কুক্ষিগত! বিচার ব্যবস্থার কাছে বিশেষ কিছু আশা করে আর লাভ হবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবশিষ্টটুকু আজ কেন্দ্রীয় সরকারের মর্জ্জি নির্ভর। এর মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে 'এক জাতি এক ভোট' কমিটির কাজ। স্পষ্টতই একনায়কত্বের ষ্টীম রোলার চালিয়ে বহু জাতির সমষ্টি ভারতবর্ষের ঘাড়ে

নাগপুরি এক-জাতীয়ত্ব চাপাতে চাইছে। এই সব কিছুর আড়ালে যা' কিছু অধিকার গত ৭৫ বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ অর্জন করেছে, সবই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

তথ্য জানার অধিকার, ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজের অধিকার, বনাধিকার, শিক্ষার অধিকার, খাদ্যের অধিকার, লোকপাল আইন, পরিবেশ-বন সংরক্ষণ আইন, ন্যূনতম মুজরী, ৮ ঘন্টার শ্রম দিবস, সবই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 'ব্রিটিশদের ভাগ কর, শাসন কর' নীতিই আজকের শাসকদের হাতিয়ার। পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেওয়াই যেন ভারত রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের বিপুল জনতা কতদিন সইবে এই অধিকার হীনতা! তথাকথিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ক্লীবত্ব আর অবাক করে না। উগ্র হিন্দুত্বের আগ্রসন বাদ দিলে বাকী সব প্রশ্নে, আর্থিক নীতির প্রশ্নে, পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনে সহায়তার প্রশ্নে তারা সবাই প্রায় একই অবস্থানে আছে। ফ্যাসিবাদী সরকার চালানোর আদর্শ পরিবেশ। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা মানুষ দীর্ঘকাল অন্যায় মেনে নিতে পারে না। আমরা আশাবাদী। বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষার দেশ ভারতবর্ষ। একটি উগ্র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শাসন, দেড়'শ কোটি মানুষের এই দেশ কখনই মেনে নিতে পারে না।

আগামী দিন প্রতিবাদেরও।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR), সোনারপুর শাখার অন্যতম সদস্য সুজয় ভদ্রের আকস্মিক জীবনাবসান

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR), সোনারপুর শাখার অন্যতম সদস্য সুজয় ভদ্র ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ভোরবেলা সোনারপুরে তাঁর নিজগৃহে আকস্মিক জীবনাবসান হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল থাকলেও, অসম্ভব উদ্যমশক্তি ও মনের জোর নিয়ে শাখার প্রতিটি কর্মসূচীতে তাঁর সক্রিয় ভুমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো।

২৭ নভেম্বর ২০২৩, APDR, সোনারপুর শাখার আহ্বানে প্যালেস্টাইনবাসীর উপর দখলদার রাষ্ট্র ইজরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিলে পুরো পথ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার তিনি হেঁটেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় দৃপ্ত প্রতিবাদী স্লোগান। পথসভাতেও তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কালা দিবস পালনের কর্মসূচীতেও তিনি অংশ নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সক্রিয়ভাবে। দীর্ঘদিনের মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী সুজয় ভদ্র ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমী ও গুণগ্রাহী। সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুরে তাঁর নিজস্ব বাসগৃহই ছিল এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার নিয়মিত বৈঠকের স্থান। তিনি নিজ উদ্যোগে তাঁর বাড়িতে শাখার তত্ত্বাবধানে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন যেখানে বক্তব্য রেখে গেছেন বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। সুজয় ভদ্রের প্রয়াণ শুধু সোনারপুর বা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নয়, সারা বাংলার মানবাধিকার আন্দোলনে এক অপূরণীয় ক্ষতি। ১৭ ডিসেম্বর মৃত্যুর পর সোনারপুর শাখা তাঁর মরণোত্তর দেহদানের চক্ষু দানের উদ্যোগ নিলেও সেটা করা সম্ভব হয়নি।

শাখার সদস্যরা পুস্পস্তবক দিয়ে সংগ্রামী শ্লোগানের মাধ্যমে প্রয়াত সুজয় ভদ্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, প্রয়াত মানবাধিকার কর্মী সুজয় ভদ্রের স্মরণসভা আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে সোনারপুর শাখার তরফে।

২৮ পাতার পর

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

মাধ্যমে। স্থানীয় তদারকি ব্যবস্থা যতদিন চালু ছিল ততদিন ব্যবহারকারীদের এতে যুক্ত থাকা, দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা বজায় ছিল। যা নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের পক্ষে, যদিও তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া আছে প্রচুর, চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তার ফলে স্থানীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত শুকিয়ে গেল এবং এগুলির উন্নতির জন্য সরকারি তহবিলের ওপর নির্ভরতা বাড়লো। আর বাড়ল এই সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য সরকারি অফিসারদের ওপর অতি নির্ভরতা। এইভাবে সরকারি আগ্রাসনের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের আন্তরিক তদারকি ব্যবস্থাটা সরকার ই বন্ধ করে দিল। এবং গ্রামীণ অর্থনীতি বাঁচিয়ে রাখতে। CPR গুলি কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটাও সরকার ই ভুলিয়ে দিল। এই যে তাদেরই সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদকে স্পর্শ করার সুযোগ থেকেও গ্রামের দরিদ্র মানুষ বঞ্চিত হতে লাগলো এর কোপ সব থেকে বেশি এসে পড়ল S C /ST দের ওপরে।

বহুমত - বিতর্ক, আদানপ্রদান এবং সাধারণ ঐক্যমত, এই পথই সংগঠনের প্রাণ শক্তি

সঞ্জীব আচার্য্য

আগামী মার্চ,'২৪ APDR এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিতহবে। গত ২০২২-এর সম্মেলন বহু বিতর্ক এবং শেষমেষ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। বিতর্ক এবং ভিন্নমতের ঘটনা APDR এর মতো সংগঠনে নতুন নয়, আশাতীতও নয়। ভিন্নমতের চর্চা ও বিতর্ক করে আপাত একটি সহমত তৈরী করা এবং সংগঠনের সচল রাখা, এটাই APDR-এর ঐতিহ্য। কিন্তু গত সম্মেলনে এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারিনি। এরও আগে সংগঠনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিতর্ক হয়েছে।

গত শতাব্দীর নয়ের দশকের শুরুতেই বাবরি মসজিদ ভাঙার পর RSS ও তার সহযোগী কয়েকটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সাম্প্রদয়িকতা, বিভেদের রাজনীতি এবং বিশেষতঃ বাবরি মসজিদ ভাঙার মতো জঘন্য অপরাধের পর সাধারণ মানুষ এবং APDR এর সদস্যদের অনেকের কাছেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ এবং সমর্থনযোগ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু চিরকাল মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং নিষিদ্ধকরণের অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে APDR সোচ্চার থেকেছে। বিভেদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি না, নিষিদ্ধকরণ কোনটাকে বিরোধিতা করা বেশি জরুরি—এই দ্বন্দ্বে ঘটনার সাথে-সাথে প্রচারে নামা বা কর্মসূচি নেওয়া থমকে গিয়েছিল। এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে , সাধারণ সভা হয়েছে, কেন্দ্রীয় এমন-কী শাখাস্তরে। সবশেষে নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে সাধারণ সহমত তৈরী হয়েছে। RSS-এর বিভেদের রাজনীতিকে, হিন্দুত্ববাদকে রাজনৈতিকভাবেই বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু এই কঠিন কাজে আশু চটজলদি সুফল পাওয়ার প্রত্যাশায় নিষিদ্ধকরণের মতো অগণতান্ত্রিক পাঠের সমর্থক হওয়াটা গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগঠনের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে। এটাই সংগঠনের সাধারণ মত হিসাবে উঠে এসেছিল। কেউ কেউ এই মত মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তারা কেউ বিভাজনের রাস্তায় যায়নি।

RSS ও তার সহযোগীদের নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে সংগঠনের ঐক্যমত না হওয়ায় সংগঠন প্রথমে কিছুদিন প্রতিক্রিয়া জানানো বা কর্মসূচি নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ছিল। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সংগঠনের নিরবতা অনেককেই সংগঠনের 'ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার' চলতি রীতি ও বিধান নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই সংকট ভবিষ্যতেও যাতে সংগঠনকে বিভ্রান্ত না-করে সেজন্য হুগলী জেলার কয়েকজন সদস্য শিলিগুড়ি সম্মেলনে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার' নিয়ম চালু করার জন্য গঠনতন্ত্রে পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিল। এই প্রশ্নেও সংগঠনে বিতর্ক হয়। সাধারণ সভা করে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উভয় মতের ভালো মন্দ নিয়ে বিভিন্ন মতামত আসে। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যই ''নীতিগত প্রশ্নে সহমতের ভিত্তিতে চলার'' পথকেই APDR-এর মতো বহুমতের সংগঠনের শক্তি হিসাবে ব্যক্ত করেন। সাংগঠনিক প্রশ্নেও সহমতের চেষ্টা করা কিন্তু একেবারে সম্ভব না হলে, প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ গঠনতন্ত্রে গৃহীত হয়। এই বিতর্ক সংগঠনের মধ্যে কোনও বিভাজন তৈরী করেনি বরং সরাসরি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিভিন্ন বিপদ সম্পর্কে, সংখ্যালঘুর মতকেও সম্মান জানানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংগঠনে একটা সচেতনতা তৈরী হয়েছিল ।

গত শতাব্দীর নয়ের দশকের শেষে NGO প্রশ্নে সংগঠনে বিতর্ক ওঠে। গণআন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা ইস্যুতে বহু NGO কাজ করে এবং দেশি বিদেশী, সরকারি বেসরকারি ফান্ড পায়। কাদের স্বার্থরক্ষার্থে এইসব ফান্ডেড NGO রা কাজ করে তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। APDR কোনোরকম দেশি বিদেশী, সরকারি বেসরকারি ফান্ড নেবে না এ-বিষয়ে সংগঠনে কোনও মতের ফারাক ছিল না কিন্তু যৌথ আন্দোলনে NGO-দের সঙ্গে নিয়ে একসাথে কাজ করা নিয়ে বিতর্ক হয়। সাধারণ সভায় আলোচনা শেষে মোটামুটি ঐক্যমত হয় এবং ঠিক হয় সাধারণ ভাবে NGO-দের সাথে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলবে না, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে যৌথ আন্দোলনে NGO-দের নিয়ে একসাথে কাজ করতে হলে, কেন্দ্রীয় স্তরে সম্পাদকমণ্ডলীতে এবং শাখাস্তরে হলে, শাখায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বামফ্রন্ট আমলের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে APDR সাধ্য মতো সক্রিয় থেকেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকার এর এই ইস্যুগুলি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে খুব বেশী জায়গা না-পাওয়ায় APDR একক ভাবেই লড়াই চালিয়েছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়, নেতাই-এর অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায়ও APDR প্রচার ও প্রতিবাদ গড়ে তোলে। এই ঘটনাগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলি ও বিশেষত তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদে

পথে নামে। দেরিতে হলেও নাগরিক সমাজের অনেকে এই প্রতিবাদে সামিল হন। নাগরিক সমাজের একটা অংশ এই প্রতিবাদেকে বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার লড়াইয়ে পরিণত করার ডাক দেন। এই পর্যায়ে সংগঠনের মধ্যে কেউ-কেউ সেই ডাকে সারা দিয়ে পরিবর্তনের লড়াইয়ে নিজেরা যুক্ত হয়ে যান এবং APDR কে ও সামিল করার চেষ্টা করেন। সিঙ্গুর আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলা কৃষিজমি রক্ষা কমিটিতেও তাদের সাথে যৌথ আন্দোলনে যাওয়ার প্রশ্নে শেওড়াফুলিতে সাধারণ সভা হয়।

কৃষি জমিতে শিল্প করলে খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। অনিচ্ছুক কৃষকের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিলে কৃষকের জমির অধিকার, জীবিকার অধিকার, জীবনের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলো সামনে রেখে সিঙ্গুর-এর কৃষকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে APDR প্রথম থেকেই ছিল। এরপর তৃণমূল কংগ্রেস যুক্ত হয় এবং স্থানীয় স্তরে তৈরী হওয়া কৃষি জমি রক্ষা কমিটির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। কৃষকের অধিকার রক্ষার আন্দোলন রাজ-ক্ষমতা দখলের ইস্যুতে পরিণত হয়। কৃষকের অধিকার রক্ষা করার জন্য এই লড়াইয়ে সামিল হওয়া। কিন্তু রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে চায়। তাই, একই ইস্যুতে আন্দোলনে যুক্ত হলেও APDR ও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবিও আলাদা, অভিমুখও আলাদা। তাই APDR নিজের মত করে এই আন্দোলন জিএই মতের পক্ষেই সাধারণ সদস্যরা সমর্থন দেন।

এই আন্দোলনে চাষীদের পাশে থাকবে। তৃণমূলের সাথে যৌথ কর্মসূচিতে যাবে না। এরপর নন্দীগ্রাম, লালগড়, নেতাই এর ঘটনায় বামফ্রন্ট সরকারের হাড় হিম করা সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গে গণ আন্দোলনে এতদিনকার জমে থাকা জড়তা ও ভয় কাটিয়ে নাগরিক-বুদ্ধিজীবী সমাজ রাস্তায় নামে। এদেরই একটি অংশ পরিবর্তনের ডাক দেয়। বামফ্রন্টকে মসনদ থেকে সরিয়ে তৃণমূলকে বসানোর জন্য এ-এক নাগরিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগে APDR-এর কেউ-কেউ সামিল হয়ে যান। APDR-কেও যুক্ত করার চেষ্টা করেন। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা সম্মেলনে অন্ধকার ঘরে মোমবাতির আলোয় চলা সেই স্মরণীয় বিতর্ক, ''সমুদ্রে তুফান উঠলে ছোট ছোট নৌকা ছেড়ে সকলের বড় জাহাজে ওঠা উচিত'' এই তুলনা টেনে পরিবর্তনের ডাকে সামিল হওয়ার জন্য যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু APDR-এর সাধারণ সদস্যরা এই যুক্তি গ্রহণ করেনি। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি থেকে দূরে থেকে অধিকার অর্জনের লড়াই করার দীর্ঘ ঐতিহ্যের পক্ষে যুক্তি ও মত দেন অধিকাংশ সদস্য। কয়েকজন এই সিদ্ধান্ত না-মানলেও সংগঠন তার সিদ্ধান্ত বজায় রাখে। ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক লড়াইয়ে কোনও দলের পক্ষে সামিল হওয়ার সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে ক্ষমতায় আসার পর ওই দল যদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালায়, (যা প্রায় অবধারিত) তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে সংগঠন দুর্বল হয়ে যাবে না-তো? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে তাকে মানিয়ে নেওয়ার বা নৈতিক প্রমাণ করার অপচেষ্টায় সামিল হয়ে যাবে না-তো! এই প্রশ্নগুলো থেকেই পরিবর্তনের ডাক দিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সামিল হয়নি সংগঠন।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের পরেই সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দেয়। রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতেই APDR-এর পথ চলা শুরু হয়েছিল। নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতা দখলের পার তৃণমূল সরকার পাল্টি খায়। কেস-টু-কেস আদালতে বিচার করে বন্দিমুক্তির জন্য একটি কমিটি তৈরী করা হয়। শুধু তাই নয়, মুক্তি পেতে গেলে সরকারের দেওয়া শর্ত মানতে হবে যার মধ্যে একটি হচ্ছে নিজের পছন্দ মতো রাজনীতি করা যাবে না। হায়! চুল বেচে চিরুনি কেনার মোপাসীয় রসিকতা। APDR, সরকারের এই অনৈতিক ঘোষণার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করে। রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির বিষয়টা চিরকালই রাজনৈতিক এবং সরকারের সদিচ্ছা ও নীতির উপর নির্ভরশীল। গান্ধীর দাবিতে ব্রিটিশ ভাড়াটে কিংবা মায়ানমারে সেনাশাসকের সময়ে বা ৭৭-এর বাম সরকারের আমলে রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি হয়েছে এবং সেটা সরকারের ঘোষণার মধ্যে দিয়েই হয়েছে। আদালতে আলাদা-আলাদা বিচার করেও নয়, বার্তা দিয়েও নয়। কিন্তু সংগঠনের মধ্যে কিছু সদস্য সরকারের এই ঘোষণায় কোনও ভুল দেখতে পেলো না। তারা বরং সংগঠনের রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করাকে ভুল বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় নামলো। ২০১০ সালে বেলডাঙ্গায় যারা পরিবর্তনের ডাক দেওয়া 'জাহাজে সওয়ারী' হওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তারাই এখন সদ্যজাত সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কিছু করার মধ্যে চক্রান্তের ভূত দেখতে শুরু করলেন। বিতর্ক হলো ইস্ট লাইব্রেরিতে। আন্দোলন করে সরকারকে না-চটিয়ে বরং

কমিটিতে থাকার সুবাদে সরকারের সান্নিধ্যের সুযোগ ব্যবহার করে কিছু রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্ত করা যাবে এমন ইঙ্গিতেও সংগঠনকে ভাসিয়ে নেওয়া গেল না। বেশীরভাগ সদস্যই রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে লড়াই করার শপথ নিলেন।

এরপর সংগঠনে বহু প্রশ্নে নীতিগত মত পার্থক্য থাকলেও দীর্ঘদিন সেটা নিয়ে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে কোনও সাধারণ সভা করে বিতর্ক ও মত বিনিময় হয়নি। সংগঠনে মতানৈক্যের মেদ জমেছে, মেঘ জমেছে। নীতিগত প্রশ্নে অতীতের মতো বিতর্ক করে সংগঠনের একটা সাধারণ মত তৈরী হওয়ার পরিবর্তে চোরা ব্যক্তি বিদ্বেষ ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নিজেদের সরিয়ে নিয়ে পাল্টা APDR তৈরির বিপজ্জনক পথের দিশারী হয়েছে। বরং বিতর্কগুলো সবাই খোলা মনে আলোচনা করলে সংগঠন শক্তিশালী হতো।

বিতর্ক ১: করোনা পরিস্থিতিতে অধিকার কর্মীদের বক্তব্য কি হওয়া উচিত ?

করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের বহু ফতোয়া, যা সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেই প্রশ্নে আমরা অধিকার কর্মী হিসাবে কি মত রাখবো? বিপর্যয়ের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য লকডাউন ঘোষণা করে ট্রেন, স্কুল কলেজ, বাজার, চলাচল, জীবিকা বন্ধ করে রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগঠন দেখবে? এই সিদ্ধান্তের শিকার সাধারণ মানুষ তাদের জীবিকা, শিক্ষার অধিকার হারাচ্ছে। সংগঠন এ-বিষয়ে কী অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করবে, না বিপর্যয়কে গুরুত্ব দিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেবে? D.M act চালু করে, সরকার নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার আপাত স্থগিত রাখার কৌশল নিয়েছে। এ-ব্যাপারে সংগঠন প্রতিবাদ করবে, না প্রশ্নাতীতভাবে D.M act মেনে চলবে? ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করার মত অসাংবিধানিক বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করবে, না মেনে নেবে? বিপর্যয়ের পরিস্থিতির মধ্যেই সরকার একের-পর-এক জনবিরোধী বিল সংসদে পাশ করিয়ে নিচ্ছে! প্রতিবাদ আন্দোলন করা উচিত, না বিপর্যয় পরিস্থিতিতে সেই কাজ হটকারী হয়ে যাবে? সংগঠনের সম্মেলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায় পালন করার চেষ্টা করা উচিত, না বিপর্যয়কে গুরুত্ব দিয়ে আপাত স্থগিত রাখা উচিত? এ-বিষয়গুলি নিয়ে সংগঠনে একাধিক মত রয়েছে, থাকাই স্বাভাবিক। করোনার আতঙ্ক কর্পোরেটের তৈরী করা এক চক্রান্ত; তাই করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করা দরকার, না-কী করোনার বিপদ বাস্তব, এবং এটা বিপর্যয়, কিন্তু সরকারের এই বিপর্যয় মোকাবিলা করার পথ ও পদ্ধতি অনৈতিক ও অমানবিক তাই করোনার সতর্কতা মেনেই সরকারি কাজের বিরোধিতা করা উচিত, অথবা করোনার পরিস্থিতি ভয়াবহ এবং এই পরিস্থিতিতে সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া নিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে যাওয়াটা হটকারিতা—এরকম বিভিন্ন উপলব্ধি সংগঠনের কর্মীদের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। কিন্তু প্রয়োজন আলোচনা করে, তর্ক করে সংগঠনের একটা সাধারণ ঐক্যমত তৈরী করা। করোনা পরিস্থিতি এখন না-থাকলেও প্রশ্নগুলি নিয়ে APDR কর্মীদের মতামত আদান-প্রদান এখনো গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের এমন কোনও পরিস্থিতিতে মতৈক্যের অভাবে সাংগঠনিক অচলতা যাতে আবার না-হয়, সে কারণেই।

APDR কি শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবে ?

বন্দি মুক্তির দাবিতে APDR এর পথ চলা শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে মূলত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করাই ছিল সংগঠনের মুখ্য লক্ষ্য। মতপ্রকাশের অধিকার, পছন্দমতো রাজনীতি করার অধিকার, পুলিশ হাজত কিংবা জেলে নির্যাতিত না-হওয়ার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে সংগঠনের বিস্তৃতি হয়। মূলত বিষয়গুলি ছিল নাগরিকের ব্যক্তি অধিকার সম্পর্কিত এবং কর্মসূচির অভিমুখ ছিল প্রচার ধর্মী। প্রশাসন এবং আদালতে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হতো। মানুষকে বা নির্যাতিতদের সঙ্গে নিয়ে কোনও আন্দোলন গড়ে তোলা রীতি হিসাবে ছিল না, কিন্তু আন্দোলনরত কোনও গোষ্ঠী বা সংগঠনের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে এলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা অন্যতম দায় ছিল। কিন্তু বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে, ক্রমে-ক্রমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেহারার বদল ঘটে। জল, জমি, জঙ্গল, পরিবেশ, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য'র উপর মানুষের অধিকার সরকার নিজেই আইন বানিয়ে কেড়ে নিতে শুরু করে। এর প্রতিবাদ করলে গ্রেপ্তার এবং জেলবন্দি! শুধু কোনও ব্যক্তি নয়, সমগ্র গোষ্ঠী'র অধিকার লুঠ হয়ে যাচ্ছে! আগে অধিকার-এর কাগুজে স্বীকৃতি ছিল, বাস্তবে মানা হত না; আর,

এখন অধিকার হরণের জন্য আইন বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে! আগে গণতন্ত্রের মুখোশ অন্তত ছিল। অধিকার গুলির সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু বাস্তবে পুলিশ, প্রশাসন শাসকের পক্ষে, রাষ্ট্রের পক্ষে থেকে আইন ভঙ্গ করতো। এই বৈপরীত্যকে সামনে রেখে নাগরিক আন্দোলনের একটা পরিসর পাওয়া যেত যে পরিসরে APDR একটা অধিকারের ভাষ্য তৈরী করে স্বতন্ত্র আন্দোলন করতে পারতো; যার চরিত্র সাধারণ রাজনৈতিক দলের থেকে আলাদা ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই মুখোশটাও আর নেই। রাষ্ট্র নিজেই আইন বানিয়ে মানুষের জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জমি, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাথমিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। জীবনের অধিকার, মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের ইস্যুগুলি নিয়ে আন্দোলন করার দাবি আসছে মানুষের কাছ থেকে। কোথাও কোথাও সংগঠন এই আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে বা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে। প্রচলিত রীতি থেকে একটু আলাদা। সামাজিক আর্থিক অবস্থানের নিরিখে সংগঠনের কর্মীদের চেহারা বদলাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষ সংগঠনে আসছেন। স্বাভাবিকভাবেই সংগঠনের চেহারা বদলাচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার ইস্যুতে আন্দোলন করার জন্য রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাহলে, APDR কি এ-বিষয়গুলিতে ঢুকবে ? রাজনৈতিক দলগুলির সাথে বিরোধ বা সমন্বয় কী ভাবে হবে ? আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ কি APDR করবে ? সাংগঠনিক কাঠামো বা গঠনতন্ত্র কি সেই কাজ করার জন্য উপযুক্ত? অন্যান্য নাগরিক বা গণতান্ত্রিক ইস্যুগুলিতে শ্রমজীবী মানুষকে কি সংযুক্ত বা আগ্রহী করা যাবে? আবার সঙ্কুচিত গণতান্ত্রিক পরিসরে নাগরিক আন্দোলনের ইস্যুগুলি ক্রমশ পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে; এই বিষয়গুলিতে কাজ করে ন্যূনতম সফলতার সম্ভাবনা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে, এমন-কী আদালতেও ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা দুর্বল হচ্ছে!

এমত পরিস্থিতিতে সংগঠন কী-ভাবে এগোবে বা অন্তত ধরে রাখা যাবে? বিভিন্ন প্রশ্ন সদস্যদের মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ-বিষয় নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বিতর্ক করে, আলোচনা করে সঠিক উত্তর সন্ধানের চেষ্টা হয়নি, কিন্তু হওয়া উচিত।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই মানে-কী কেবল বিজেপি কে নির্বাচনে পরাস্ত করার সার্বিক চেষ্টা ও অঙ্গীকার ?

স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু, গণতন্ত্রের একটা স্বীকৃতি ছিল। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে তারা রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রত্যাশা মত পেতেন না। কিন্তু এ-নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত। রাষ্ট্রকে তার ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করা যেত। রাষ্ট্র-সরকার-শাসকদলকে প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জ করার অন্ততঃ সীমিত একটা পরিসর ছিল। গত দশ বছরে বিজেপি-আর এস এস এর নেতৃত্বে সারা দেশে এক ফ্যাসিবাদী জমানা তৈরী হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত সরকারি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট। আদালতে ও ন্যায় বিচার পাওয়া এখন প্রত্যাশার বাইরে। অধিকার নিশ্চিত করার পরিবর্তে সরকার নিত্য নতুন আইন বানাচ্ছে যে গুলির একটাই লক্ষ্য, ''সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে কর্পোরেটের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ তুলে দেওয়া'', ধর্মীয় বিভেদের রাজনীতিতে মানুষকে ব্যস্ত রাখা। সংখ্যালঘু আতঙ্কে আর সংখ্যাগুরু উন্মাদনায় ব্যস্ত থাকবে। অধিকারের জন্য লড়াই, আড়ালে চলে যাবে। কেউ-কেউ না-মানতে চাইলে মিথ্যা মামলা কিংবা হামলা করেই তাকে সন্ত্রস্ত করে রাখা। অধিকারের ধারণায়, যে-দেশের স্বপ্ন আমরা দেখি, ঠিক তার বিপরীত একটা দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে এই ফ্যাসিবাদী দল ও সংগঠন। এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই APDR এর কাছে মূল লক্ষ্য ও দায় উচিত। এ নিয়ে সংগঠনের মধ্যে সার্বিক ঐক্য রয়েছে। সাধ্যমতো সংগঠনের তরফে কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে যৌথ আন্দোলন হচ্ছে তার কোনটিতে যাবে, আর কোনটিতে যাওয়া উচিত নয়, সে-নিয়ে অবশ্যই আমাদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে।

বিজেপি ক্ষমতায় থাকায় ফ্যাসিবাদের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে! যৌথ আন্দোলনের কোনও-কোনও মঞ্চ থেকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই মানে কেবল বিজেপিকে নির্বাচনে পরাস্ত করার সার্বিক চেষ্টা ও অঙ্গীকার হিসাবে দেখানো হচ্ছে। ভাবনা হচ্ছে যে, নিজ রাজ্যে, অন্যান্য রাজ্যে বা স্থানীয় স্তরে বিজেপি বাদে অন্যান্য দলগুলির সন্ত্রাস বাতেফ্যাসিবাদী আচরণ নিয়ে বলার সময় এখন নয়। এ-ভাবনায়-তো বিজেপি'র সুবিধা হয়ে যাবে!

এই বক্তব্যকে APDR কী-ভাবে বিচার করবে? নির্বাচনে কোনও বিশেষ দলকে জেতানো বা হারানোর কোনো কাজ APDR করে না। সঙ্গত কারণেই। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষেত্রে কি কোনও ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত? ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্য রাজ্যের শাসক দলের,

সরকারের সন্ত্রাস নিয়ে চুপ করে থাকার পথ কি APDR সমর্থন করতে পারে? অন্যান্য শাসকদলের সন্ত্রাস বা নরম-কোমল হিন্দুত্ববাদ বা কর্পোরেট তোষণ কী ফ্যাসিবাদের হাতকেই শক্ত করে না? একদিকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, দায় আর অন্যদিকে, নিজের পছন্দের দলকে বাঁচিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের আপোষকামী পথ সম্পর্কে আপত্তি, এই দু'য়ের মধ্যে অনেক সদস্যের কাছেই বহু বিষয় প্রশ্ন আকারেই থেকে গেছে। সংগঠনেই একাধিক মত আছে। প্রয়োজন, সবটাই খোলা মনে আলোচনা করা। অমীমাংসিত অনালোচিত এই বিষয়গুলি নিয়ে APDR-এর সাধারণ সভায় মতের আদান-প্রদান হওয়া জরুরি।

রাম মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

গৌতম চৌধুরী

রাম মন্দির নির্মাণ হল। বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠলো এই প্রতিকী নির্মাণ। ধর্মের নামে রাজনীতি, বর্বরতার এমন রাজকীয় উদ্বোধন এর আগে বোধহয় পৃথিবী দেখেনি। ১৯৯২ সালের মসজিদ ধ্বংসও ছিল প্রতিকী। পাঁচশো বছরের পুরনো সেই সৌধকে গুঁড়িয়ে দিয়ে,তআইনি পথেদ তার জমি কেড়ে নেওয়া ছিল ভারতের সভ্যতা, সমন্বয়ী সংস্কৃতি, সম্প্রীতি আর ন্যায় বিচারের পরিপূর্ণ ধ্বংসের সূচনার প্রতীক। এই মসজিদ ধ্বংসের পর দেশজোড়া সংগঠিত সন্ত্রাস আর রাজনৈতিক কূটকৌশলের মধ্যে দিয়ে অর্জিত ক্ষমতার দাম্ভিক অভিব্যক্তি—এই মন্দির হল উগ্র সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা আর 'ইতিহাসের প্রতিশোধ'-এর ফ্যাসিস্ট প্রতীক।

১৯৪৯ সালে কতিপয় সাধুর দ্বারা মসজিদের ভেতরে ''রামলালা আবির্ভূত'' হলে, সেখানেই পৌরাণিক চরিত্র রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল মাতা কৌশল্যার আঁতুড় ঘর এখানেই ছিল বলে হৈচৈ শুরু হল। এর আগে পর্যন্ত এই মসজিদ নিয়ে বিবাদ ছিল স্থানীয় সমস্যা। এখন 'বিতর্কিত' ঘোষণা করে দেওয়া জমিতে মসজিদের দরজায় যে তালা পড়ল, তা খুলে দেওয়া হল ১৯৮৬-তে, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর অবিমৃষ্যকারিতায়, সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক লাভের আশায়। তালা খোলার আদেশের ঠিক আগে শাহ বানু নামে এক মুসলিম বৃদ্ধা সুপ্রিম কোর্টে খোরপোষের দাবিতে মামলা করলে আদালত সেই মহিলার পক্ষে রায় দেন। সেই রায়ে গোঁড়া মুসলমানেরা বিক্ষুব্ধ হন, মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড আপত্তি জানায় যে, এই রায় শরিয়ত বিরোধী। তখন, তাদের সন্তুষ্ট জন্য সুপ্রিম কোর্টের ঐ রায়কে বাতিল করতে নতুন আইন তৈরী করল রাজীব সরকার। এতে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুত্ববাদীদের পালে হাওয়া লাগলো। তাদের আন্দোলনের চাপে এবং হিন্দু ভোটকে নিজেদের পক্ষে ধরে রাখতে, রাজীব গান্ধী বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেবার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ, একদিকে মুসলিম মৌলবাদকে, অন্যদিকে হিন্দু মৌলবাদকে একইসঙ্গে সন্তুষ্ট করা হল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে। এভাবে খুলে দেওয়া হল বিপর্যয়ের দ্বার। বছরে একবার পূজার জায়গায় এখন শুরু হয়ে গেল মসজিদে অবাধ পূজো-পাঠ। মুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ অব্যাহত রইল।

একই সঙ্গে শুরু হল বর্তমান শাসক দলের সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে উস্কে দিয়ে দাঙ্গার রাজনীতির হাত ধরে ক্ষমতা দখলের ধূর্ত আগ্রাসী অভিযান।

সোমনাথ থেকে গুজরাট বিজেপি'র রামকৃষ্ণ আদবানির রামরথের ভারতব্যাপী অভিযাত্রা। তার সঙ্গে ঘটে চলল, একের-পর-এক দাঙ্গা। অসংখ্য মানুষ হতাহত হল, মানুষের রক্তের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল সেই রথ। তার পরেও তার রেশ ধরে ঘটল আরও বহু বীভৎস দাঙ্গা। এবং ১৯৯২ সালে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল এবং বিজেপি'র ধূর্ততা, কপটতা, মিথ্যাচার আর ব্যাপক বিধ্বংসী গুণ্ডামির সৃজনশীল প্রয়োগে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বাবরি মসজিদ, প্রকাশ্য দিনের আলোয় হাজার হাজার মানুষ মিলে, দলের নেতাদের পরিচালনায়। তা ঘটল কংগ্রেসের অবিচল-প্রতিক্রিয়াহীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে। যারা এই অপরাধে নেতৃত্ব দিলেন, তারাই পরে দেশের শাসক হিসেবে নির্বাচিত হলেন।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে এই কাজের যে মহড়া দেওয়া হয়েছে, তাতে স্থানীয় পুলিশের প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল। অথচ আদালত বলেছে, ১৯৯২ সালে এই মসজিদটি ধ্বংস করেছে অচেনা 'সমাজ-বিরোধীরা' এবং এই হামলা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না। যদিও ২০১৯ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, এটি ছিল এক ''সুপরিকল্পিত ঘটনা'' এবং ''আইনের শাসনের এক গুরুতর লঙ্ঘন''। (বিবিসি বাংলা, সৌতিক বিশ্বাস, ১ অক্টোবর ২০২০)

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগ (ASI) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয় যে, মসজিদের নীচে একটা কাঠামো ছিল যার গঠনশৈলী ইসলামিক নয়। শুধু এরই ওপর

ভিত্তি করে ২০১৯ এর নভেম্বরে মহামান্য শীর্ষ আদালতের পাঁচজন বিচারকের বেঞ্চ সম্পূর্ণ একমত হয়ে বাবরি মসজিদের জমি তুলে দিল মন্দির পন্থীদের হাতে, যদিও তাদের কার কী বক্তব্য তা জানানো হল না। সেই রায়ে ন্যায় বিচারের প্রাথমিক নীতিকেও অস্বীকার করে, তথ্য প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে ''বিশ্বাস''-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হল। বলা হল যে, হিন্দুদের বিশ্বাস এখানেই শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। তাই মসজিদের জমি ''শ্রী রামলালার হাতে'' তুলে দেওয়া হল। এবং একই নিঃশ্বাসে বলা হল, মসজিদ ভাঙা বে-আইনি কাজ হয়েছে। অথচ এতবড় অপরাধে অভিযুক্তদের কোনও শাস্তি হল না। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিশেষ সিবিআই আদালত তাদের সবাইকে খালাস করে দিয়েছে।

মসজিদ ধ্বংসের পর জয় এলো একের-পর-এক নির্বাচনে। বিজেপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, ১৯৯৮ সালে। কিন্তু তা' টিকে রইল না। এল সংসদীয় বিরোধী পক্ষের শাসন ২০০৪ সালে, চলল ২০১৪ পর্যন্ত। সেই অবকাশে রাম ভক্তের দল-বল হাত ধরলো কর্পোরেট পুঁজির, টিকে থাকার গ্যারান্টির জন্য। খুলে গেল বিপুল ঐশ্বর্যের সিন্দুক। ভারতবাসী হতবাক হয়ে দেখলো নির্বাচনী প্রচার কাকে বলে। ইতিমধ্যে বিজেপি'র প্রথম সারির সব নেতাদের স্থানচ্যুত করে দিলেন গুজরাট গণহত্যার নায়ক মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সারা দেশ জুড়ে একসাথে জায়েন্ট স্ক্রিনে বিজাপি'র একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা নরেন্দ্র মোদির ভিডিও বক্তৃতা বারবার দেখলো আর শুনলো দেশবাসী। চওড়া হাসি আশ্বাস দিল দেশবাসীকে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, কালো টাকা আর দুর্নীতি থেকে মুক্তির। এল আরও অনেক কিছু। নেমে পড়লো সুসংগঠিত বৃহৎ আই টি সেল, কিনে নেওয়া হল বহু সংবাদ মাধ্যম, নতুন করে জন্ম নিল বহু সংবাদ পত্র আর টিভি চ্যানেল। দেদার টাকা ছড়িয়ে পড়লো বহু প্রকাশ্য, গোপন ঠিকানায়। এলো জয় পরপর দু'বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দশ বছরের টানা শাসনে বিরোধী কণ্ঠকে প্রায় স্তব্ধ করে দেওয়া গেছে। প্রায় সমস্ত মাধ্যমকে পকেটে পুরে আর অবাধ্যদের জেলে পাঠিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে শায়েস্তা করা গেছে। সংখ্যালঘুরা, বিশেষত মুসলিমরা, দিন কাটাচ্ছেন আতঙ্কের মধ্যে। সেইসঙ্গে আতঙ্ক তারা করে ফিরছে এই ক্ষমতাবানদেরও। এবার তৃতীয়বারও জিততেই হবে, নইলে দেশের মানুষ তাদের সমস্ত অপকর্মের হিসেব মেটাতে চাইবে। সেই জয়ের জন্য তার চাই এখন আরও কিছু মোক্ষম অস্ত্র সংখ্যাগুরু জনতার ''আশীর্বাদ'' পেতে। তাই তৈরি হয়েছে এই মন্দির;বৈভব প্রদর্শনের এই মেগা-বিজ্ঞাপন;যে মন্দিরের দূষিত বাতাসে ঘুরছে শুধু ক্ষমতার আস্ফালন আর কুটিল আগ্রাসী রাজনীতির পূতিগন্ধ।

হিন্দু ভোট পাবার জন্য বুঝি এটাই দরকার ছিল! এই মন্দির দিয়েই নাকি হিন্দু-হৃদয়সম্রাট হিন্দু 'গুলাবি' হৃদয়কে মথিত করে রামরাজ্য গড়বেন। রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। যদিও এখনও এই রাষ্ট্র ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। হাজির থাকবেন প্রায় পুরো মন্ত্রীসভা আর দলের নেতারা।

যদি এরা জেতে, সেই জয় হবে ভারতবর্ষের বুকে এক নির্ণায়ক পরিবর্তন আনার জয়। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে থাকবে কী-না, সংবিধানে ঘোষিত ''স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'' থাকবে, না-আদ্যন্ত জাতিবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী নারীবিদ্বেষী স্বৈরতান্ত্রিক মনুসংহিতার শাসন আসবে, তা নির্ণয়ের নির্বাচন হবে আগামী লোকসভা নির্বাচন।

বিজেপি'র দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতিই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পালন করেনি। দেশে কালো টাকা উদ্ধার হয়নি। বিদেশী ব্যাঙ্ক থেকেও কালো টাকা ফিরে আসেনি, বরং বেড়েছে; প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ টাকাও ঢোকেনি। কালো টাকা উদ্ধারের নামে 'নোটবন্দী' করে ছোট আর মাঝারি ব্যবসায়ীদের সর্বনাশ করা হয়েছে। বছরে দু'কোটি চাকরি হয়নি, বরং চাকরি কমেছে, বেকারি বেড়েছে সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে। লক্ষ লক্ষ পদ খালি অথচ নিয়োগ বন্ধ। স্থায়ী চাকরি একেবারেই হচ্ছেনা। দুর্নীতি কমেনি, বরং আরও বেড়েছে। কৃষকের আয় দ্বিগুণ হয়নি, উল্টে কমেছে। গোটা কৃষি ব্যবস্থাকে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেবার আয়োজন চলেছে, আর তা করতে গিয়ে কৃষি আর কৃষকের সঙ্কটকে আরও তীব্র করে তোলা হয়েছে। শ্রমিকের কাজের চাপ বেড়েছে, মজুরি কমেছে, কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে এতদিনের অর্জিত অধিকার। এসে গেছে শ্রম কোড শ্রমিকের মানুষ হিসেবে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বাকি অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের প্রায় বাইরে চলে গেছে। সাধারণভাবে দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে ভয়ঙ্করভাবে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে কল্পনাতীত। এক কথায়, দেশের গরীব মানুষ, সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী, কেউ ভালো নেই। তবুও মানুষ বিকল্প না পেয়ে এদের দিকেই ঝুঁকেছে।

এতৎসত্ত্বেও, আগামী ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জয় সম্পর্কে বিজেপি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না একেবারেই।

তাই ধর্মীয় উন্মাদনায় হিন্দুদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তা না-পারলে বিপদ। একমাত্র সেই পথেই, কর্পোরেট প্রভুদের সেবা করার বিনিময়ে, এ দেশকে হিন্দু-পাকিস্তান বানানোর, ধর্মরাষ্ট্র বানানোর, এক স্বৈরতন্ত্রী দেশ বানানোর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব।

দেশের বিরোধী দলগুলোও নিজেদের গণতান্ত্রিক চরিত্রের পরিচয় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ভাবমূর্তিও পরিচ্ছন্ন নয়। তারা নিজেরা যেখানে ক্ষমতায় আছেন সেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ নামছে। তাই মানুষ তাদের ওপর আস্থা রাখতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন।

আমাদের রাজ্যের দিকে তাকালেও তা পরিস্কার হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায় ও তাঁর তৃণমূল দল শাসিত রাজ্য সরকার কোনও ধরনের বিরোধিতা সহ্য করতে রাজি নয়। সমস্ত বিরোধী কণ্ঠের টুঁটি টিপে ধরছে। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র রাম মন্দির নির্মাণের প্রতিস্পর্ধী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মাণ করছেন দীঘায় জগন্নাথ মন্দির। সে আবার সরকারি টাকায়! এ-যেন কে কত বড় হিন্দু, দরদী হিন্দু নেতা, তার প্রতিযোগিতা! এই চক্রবুহ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে ভাঙা রথের চাকা হাতে নিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষের সমস্ত প্রতিবাদ, সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন। সেইসঙ্গে চলেছে অকল্পনীয় দুর্নীতি; কিছু কিছু ধরাও পড়ছে। অত্যন্ত নির্লজ্জের মত সরকারি টাকায় বাঘা-বাঘা আইনজীবী নিয়োগ করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র জনদরদী হয়ে দুর্নীতিকে সুনীতি প্রমাণ করতে চাইছে। এরাই যখন ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলে, স্বভাবতই তা' মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এ দেশের মানুষ! এখান থেকে বেরিয়ে আসতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ আর সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য জরুরি। আজ প্রতিক্রিয়ার চরম ঔদ্ধত্যের পীঠস্থান হিসেবে মাথা তোলা এই রাম মন্দির, জগন্নাথ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিজেদের করণীয় স্থির করে নিতে হবে।

এপিডিআর-এর সমস্ত শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর আহ্বান রইল।

হিন্দুত্ববাদী ধর্ষকদের ফের কারাগারে পাঠালো সর্বোচ্চ আদালত, দেশজননী বিলকিসের লড়াইকে কুর্নিশ

অজেয় পাঠক

দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের ৭৫ বছর পর ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবদ-এর প্রধান অনুষ্ঠান ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে মোগল সম্রাট শাহজাহানের তৈরী দিল্লীর লাল কেল্লা থেকে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে 'সঙ্কল্প' ভাষণ দিয়েছিলেন 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যাঁকে কয়েকদিন আগে গুজরাত গণহত্যার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্লিনচিট দিয়েছিল দেশের আদালত।

দেড় বছর আগে গত ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট, তিনি ভাষণে যখন ভারত মাতার জয়গান করছিলেন, ঠিক সেদিনই দেশের মাতা তথা নারীদের একটি ঘৃণ্য উপহার দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। ২০০২ সালে গুজরাতের ধর্ষিতা জননী বিলকিস বানোকে ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্ত ১১ জন আসামীকে রিমিশন নীতির অধীনে মুক্তি দিয়েছিল বিজেপি শাসিত গুজরাট সরকার। মুক্তির অন্যতম কারণ না-কী ধর্ষকেরা সকলেই ব্রাহ্মণ এবং তাদের ভাল সংস্কার রয়েছে! তাই মুক্তির পর তাদের ডিজে মিউজিক বাজিয়ে উল্লাসের সঙ্গে মালা দিয়ে বরণ করা হয়। এ-যেন শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর বাহিনী নিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছেন কোনও যুদ্ধজয় করে! কার্যত নাৎসিবাদী হিন্দুরাষ্ট্র বনে যাওয়া নুতন ভারতে এটাই স্বাভাবিক ছিল— ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দু হওয়ায় ধর্ষক-খুনি মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু মুক্তি পাননি অশীতিপর প্রতিবাদী ফাদার স্ট্যান স্বামী, স্বাধীন ভারতের কারাগারে ফেলে রেখে তাঁকে কার্যত অনাহারে ও বিনাচিকিৎসায় হত্যা করেছে রাষ্ট্র। মুক্তি পাননি ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী অধ্যাপক জি এন সাইবাবা, প্রতিবাদী ছাত্রনেতা উমর খলিদ। ভুয়ো প্রমাণ তৈরী করে রাষ্ট্রদ্রোহী সাজিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিন কারান্তরালে ফেলে রেখে হত্যা করতে উদ্যোগী পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র!

বিলকিস লড়াই ছাড়েননি। ২০০২ সালের ৩ মার্চ, সেই ভয়াবহ কালো দিন, যেদিন বিলকিস বানো, তাঁর মা ও আরও তিন নারীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছিল ধর্মোন্মাদ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের বীরপুঙ্গবরা। ধর্ম না-কী এদের পরধর্মকে ঘৃণা ও বিধর্মী-নারীদেহকে ভোগ করতে শিখিয়েছে। ২০০২ সালের ওই অভিশপ্ত দিনে ধর্মোন্মাদ দাঙ্গাবাজ-ঘাতকদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে গিয়ে চরম

নৃশংসতার শিকার হয়েছিল বিলকিসের পরিবার। বিলকিসের চোখের সামনে তাঁর শিশুকন্যাকে আছাড় মেরে হত্যা করেছিল হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী ঘাতকেরা। হত্যা করেছিল পরিবারের আরও ১০ জনকে। ১১টা ধর্মোন্মাদ তাড়া করেছিল বিলকিস সহ পরিবারের নারীদের, তারপর ধরে ফেলে একে একে ধর্ষণ করে বিলকিস সহ পাঁচ নারীকে!

তারপর, লড়াই শুরু বিলকিসের বানো'র। তিস্তা শেতলাবাদ, হর্ষ মান্দারদের মত মানুষদের পাশে নিয়ে বিলকিসের সুদীর্ঘ আইনি লড়াই ঐ ১১ ধর্ষকের যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি নিশ্চিত করে। কিন্তু শাস্তির মেয়াদ ফুরোবার আগেই ২০২২ সালের ১১ আগস্ট মনুসংহিতার বিধান মেনে অহিন্দু নারীদেহ সম্ভোগের জন্য ধর্ষকদের পুরস্কৃত করে হিন্দুত্ববাদী শাসকেরা, ফলে জেলের বাইরে পা রেখে বিলকিসের ধর্ষকেরা পায় উষ্ণ অভ্যর্থনা! অন্যতম ধর্ষক শৈলেশ চিমনলাল ভাট-কে দেখা যায় গুজরাতের বিধায়কদের সাথে একই মঞ্চে বসে সম্বর্ধনা নিচ্ছেন। গুজরাত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও গোধরার বিধায়ক সি কে রাউলজি ধর্ষকদের মিষ্টি খাইয়ে ফুলের মালা পড়িয়ে বলেছিলেন ''ওরা (বিলকিসের ১১ ধর্ষক) ব্রাহ্মণ ও সংস্কারী, ওদের স্বভাব ভালো!'' ধর্ষকদের এই শুভানুধ্যায়ী রাউলজি ছিলেন ''গোধরা জেল অ্যাডভাইসারি কমিটি''-র অন্যতম সদস্য, যে কমিটি ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। আমিত শাহ'র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই সিদ্ধান্তে শিলমোহর দেয়, তারপর গুজরাত সরকার ওই ১১ জনের ধর্ষকবাহিনীকে মুক্তি দিয়ে দেয়। এরপর থেকেই শুরু হয় বিলকিসের আর-এক নতুন লড়াই।

ধর্মোন্মাদ ধর্ষকরা মুক্তি পেয়ে আবার বিলকিসের উপর হামলার ছকও শুরু করে দেয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেন বিলকিস। দেড় বছর মামলা চলার পর গত ৮ জানুয়ারি ২০২৪ সুপ্রিম কোর্ট বলে দেয়, গুজরাত সরকারের ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত অবৈধ এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত, তাই ১৪ দিনের মধ্যে (২২ জানুয়ারি ২০২৪) জেলেই ফিরতে হবে বিলকিসের ধর্ষকদের। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার কুকর্মে গুজরাট সরকারের দোসর হল কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা গত ৮ জানুয়ারি, ২০২৪ রায় দেওয়ার সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন ''একজন মহিলা যে ধর্ম বা জাতেরই হন-না কেন, তাঁর সঙ্গে নৃশংস অপরাধ করে কেউ পার পেতে পারে?'' হিন্দুরাষ্ট্র হতে চলা, নুতন ভারতে এই প্রশ্নের উত্তর হল, হ্যাঁ, পারে! আর এস এস-এর কল্পিত হিন্দুরাষ্ট্রে দেশ শাসনে একমাত্র বিধান হবে মনুস্মৃতি। এই বিধানে স্পষ্ট ভাষায় নারীদের উপর শারীরিক নিপীড়নের বিধান আছে। এর আগে কাঠুয়া, হাথরোস-সহ সমস্ত নারী-ধর্ষকদের পক্ষে প্রকাশ্যে দুই বিজেপি সরকারই ঘাতক-ধর্ষকদের পক্ষ নিয়েছে। এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট বলার বহু আগে থেকেই আমরা বেশ অবগত।

সংখ্যালঘু মুসলিম বা খ্রিষ্টানদের যারা হত্যা বা ধর্ষণ করে, তারা বিজেপি বা আর এস এস-এর কাছে বিশেষ মর্যাদা পায়। আর এস এস-এর দ্বিতীয় প্রধান মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর লিখেছেন, ''১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর পর ভারতে থেকে যাওয়া মুসলিমদের দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার পক্ষে চরম বিপদ। দেশের মধ্যে প্রচুর মুসলিম এলাকা আছে। আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে সর্বত্রই মুসলিমরা ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে সারাক্ষণ পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে।''

বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন বলেছিলেন, ''অপরাধীরা যদি তাদের সাজার পরিধিকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে, তাহলে সমাজে শান্তি-সম্প্রীতি বলে কিছু থাকবে না। রায় দেওয়ার সময় আদালতকে সতর্ক থাকতে হয়, রায়ের বিষয়বস্তু নিয়েও স্বৈরাচারী কোনো সিদ্ধান্তকে সংশোধন করা এবং সাধারণ মানুষের ভরসা বাঁচিয়ে রাখাও আদালতের কর্তব্য। এই মামলায় আসামীরা কি করেছেন আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বিশেষ করে একজন তো গোটা প্রক্রিয়ারই অপব্যাবহার করেছে। মাত্র ১৪ বছর তারা জেলবন্দি ছিল, তার মধ্যে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে বহুবার। এই অপরাধীদের সুরক্ষার আবেদন আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। আইনের শাসন জারী থাকবেই।'' বিচারবিভাগের এই বক্তব্য আপাতত স্বস্তিদায়ক হলেও নির্মীয়মাণ হিন্দুরাষ্ট্রের বিচারসভা বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও অবকাশ নেই।

২০১৯ সালের দেশের এই মহামান্য সর্বোচ্চ বিচারসভার এক রায়েই পৌরাণিক সত্যযুগের কল্পিত ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতারের মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহনের কল্পকাহিনী ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন পাঁচজন মহাজ্ঞানী বিচারক আমাদের শুনিয়েছিলেন যে, রামচন্দ্র যে ওই ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের জমিতেই জন্মেছিলেন, সনাতন হিন্দুদের এই বিশ্বাস অলঙ্ঘনীয়, তাই বাবরি মসজিদের পুরো জমিটাই রামলালার মন্দিরের জন্য বরাদ্দ হল! সনাতন ভারতের বিচারসভা এই মর্মে মান্যতা দিয়েছিলেন যে একটি বিশেষ ধর্মবিশ্বাসী একদল মানুষ যদি বহুযুগ ধরে এক কাল্পনিক মহাকাব্যের নায়ককে দেবতা ভেবে আরাধনা করে, তাঁর

আবির্ভাবভূমি বলে কোনও স্থানকে চিহ্নিত করে, তবে সেই স্থানেই সেই দেবতার উপাসনাস্থল প্রতিষ্ঠার আইনি ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়! প্রবল ধর্মবিশ্বাসের তোড়ে ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, লোককথা আর কল্পনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি নির্মীয়মাণ রামমন্দিরে রামলালার মর্মর মূর্তিতে "প্রাণ প্রতিষ্ঠা" করে দেশজুড়ে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিও সফলভাবে করা হয়ে গেছে। সুতরাং হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণে সক্রিয়ভাবে মাঠে নেমে গেছে আমাদের বিচারসভাও! বিলকিস বানো-র ধর্ষকদের মুক্তি খারিজকারী রায় হিন্দুত্ববাদি শাসকদের বিপক্ষে হলেও; ভবিষ্যতে সেটা আবার যে হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ, আইনসভা হোক বা বিচারসভা, আগ্রাসী হিন্দুত্বের কবল থেকে ভারতরাষ্ট্রের কোনও প্রতিষ্ঠানকেই রক্ষা করা যায়নি। আম্বেদকরের সেই সতর্কবাণী আজ সত্যি হয়েছে, সেখানে তিনি বলেছিলেন,ত্যদি হিন্দু রাজ বাস্তব হয়ে ওঠে, তা'হলে তা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের পক্ষে বৃহত্তম বিপর্যয় হিসেবে দেখা দেবে। মুক্তি, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের পক্ষে এটি একটি বিপদ বিশেষ। গণতন্ত্রের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।দ আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা সমবেত হয়ে সোচ্চারে লড়াকু দেশজননী বিলকিসদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠব, ত্ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বা'হাত করে শঙ্কা হরণ/দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণদ। না, মুখ বুজে হিন্দুত্বের রথের চাকায় পিষ্ট আমরা হব না।

FACT-FINDING REPORT BY APDR DARJEELING PREPARATORY COMMITTEE

Pursuant to the resolution adopted on meeting held on 30 Nov 23 to visit the families affected by the 04 Oct 23 Teesta flash flood for fact-finding purpose with regard to the irrehabilitation, the members of APDR Darjeeling preparatory committee comprising of following members visited the under mentioned flood affected sites on the given dates.

Findings :

The fact finding team after visiting the sites and interaction with the flood victims has come to this conclusion.

1. That the genuine affected victims of Garfur Busty, Teesta Bazar, numbering 08 families were not compensated with the amount of Rs 75000/- that the CM of West Bengal had disbursed at the administrative programme held in Kurseong on 08 Dec 23. They also complained that some non-genuine beneficiaries had availed the compen-sation, hence there was discrimination in award of compensation. Collusion of Panchayat officials withthe fake victims has become apparent with some vested interest in awarding them the compen -sation which they were not entitled to. One family of Najok and one family of Gielle Khola area have not received the compensation of Rs 75000/-. There are some families who belonged to scheduled caste and tribes who were deprived from compensation.

2. In the past, no proper notice had been served to the residents living on the river Teesta before the commencement of hydel dam construction at 27 mile. There had been farce public hearing which was politically influenced bringing benefits to some selected people who were closed to the then councilors (elected representative of Darjeeling Gorkha Hill Council). It seems NHPC

DATE OF VISIT	SITES VISITED	VISITING MEMBERS
17 Dec 2023	Bangey Najok,Gielle Khola, Rangpo, Melli and Tarkhola	Mrs Anulata Gurung, Mr Arun Ghatani, Mr Sudan Gurung, Miss Purnakala Thapa, Miss Uma Pradhan, Mr Nirdesh Thapa
23 Dec 2023	Teesta Bazar	Mrs Anulata Gurung, Mr Arun Ghatani, Mr Dilkush Bomzon, Mrs Uttama Sundas, Mr Saakal Dewan

did not conduct proper Social Impact Assessment and genuine public hearing of the people residing nearby to river Teesta. They are not aware of any guidelines connected with rehabilitation of dam affected people.

3. They seek direct negotiation with the NHPC with regard to compensation matters, with no mediation or interference from the existing hill administrative body GTA. They demand utmost transparency in processing of compensation.

4. They don't want to settle in state earmarked lands as it is not feasible for them to run daily business and adversely affect their livelihood as most of them are daily wage labourers. They want to settle themselves as per their convenience if they receive the compensation directly from the NHPC.

5. With the closure of quarry, where most of the families were dependent for their source of livelihood, they pray for operation of quarry on Teesta bank in compliance with environmental laws.

6. They seek strong, robust embankment along the Teesta river adjoining their settlement to protect themselves and Teesta Bazar from future flash floods.

With regard to visit to closed tea gardens, we found out that Peshok tea garden people are okay with the closure of tea garden as frequent closures had affected them a lot in past, and due to their tourism potential they are having no problems. But still there are some families who are dependent on tea industry as they do not have land for tourism purpose. But tea garden of Choongthoong is a dissimilar case as the people are facing severe financial hardship causing people to migrate for source of livelihood. Government has to intervene soon in this garden in public interest.

The list of respondents to the survey by the fact finding team is placed at Annexure .

Date: 30 Jan 24 **Convenor**

নির্ভীক সংবাদমাধ্যমে সন্ত্রস্ত শাসককুল

সন্দীপ সিংহ রায়

'কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়
অমৃতই বিষ!
মেধার ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ'।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আসন্ন অমৃত কাল উপলক্ষে অমৃত মহোৎসব শুরু হয়েছে। বাড়ি-বাড়ি রাম মন্দিরের জন্য চাঁদা চাওয়া হচ্ছে এবং খামবন্দি কিছু চাল যা ভাতের সঙ্গে ফুটিয়ে খাওয়ার জন্য বিতরণ করা হচ্ছে। প্রত্যাখ্যাত হলে বাড়িগুলি চিনে রাখা হচ্ছে। হিটলারের জার্মানি পর্যন্ত যেতে হবে না। এই পোড়া দেশের উত্তরাখণ্ডে ও অধুনা পশ্চিমবঙ্গে এই ফ্যাসিষ্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই অমৃত মহোৎসবে অমৃত ভান্ড কাদের ভাগে পড়বে ও অমৃত রূপ তীব্র হলাহলই বা কোন বিপুল কোটি কোটি জনতার জন্য বরাদ্দ তা' আর নতুন করে ভাবতে বসার দরকার নেই।

ভীমা কোরেগাও মামলার স্বরূপ আর অবিদিত নেই, দেশের শ্রমজীবী ও তথ্যাভিজ্ঞ মানুষের কাছে এই কুৎসিত আগ্রাসন আজ যেন অমোচনীয় ও অলঙ্ঘনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভীমা কোরেগাঁওর মিথ্যা সাজানো মামলায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগ একের-পর-এক গ্রেপ্তার করা হয়েছে অধ্যাপিকা সোমা সেন, আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যাডগিল, কর্পোরেটের সেবা না করে সামাজিক দায়বদ্ধতায় স্বনিয়োজিত মহেশ রাউত, সিআরপিপি'র রোণা উইলসন যার ল্যাপটপে তাঁর অজান্তে ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে ষড়যন্ত্রের মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। পরবর্তীতে অন্ধ্রপ্রদেশের তথা সারা দেশের বিখ্যাত কবি ভারভারা রাও, আদিবাসীদের পরম বন্ধু সুধা ভরদ্বাজ, গৌতম নভলখা, আনন্দ তেলতুমবে এবং দুরারোগ্য পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত অশিতীপর ফাদার স্ট্যান স্বামী, যিনি একটি সামান্য ষ্ট্র-এর অভাবে কার্যত অনাহারে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে নিহত হলেন। এ-যদি বর্বরতন্ত্র না-হয়, বর্বর তবে কে? ফাদার স্ট্যান স্বামী কমিউনিস্ট বা স্যোশালিসট কিছুই ছিলেন না, কিন্তু স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া আদিবাসীদের একান্ত কাছের মানুষ ও তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক দশক ধরে নৈতিক সমর্থন দিয়ে আসছিলেন।

একদা মারাঠা বর্গীরা নাগপুর থেকে উজিয়ে এসে সুবে বাংলায় নৃশংস অত্যাচার ও লুঠপাট করে হাহাকার ফেলে

দিয়েছিল। আর আজকের বর্গীরাও কর্পোরেট মদতে নাগপুরের পাতালঘর থেকে আর এস এস নামে শুধুমাত্র খন্ডিত বঙ্গ নয়, সারা ভারতে মানুষের জীবন-জীবিকাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আর স্বাধীন সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে? কিছুদিন আগে নিউজ ক্লিকের প্রাক্তন সম্পাদক প্রাঞ্জল পান্ডে, বর্তমান মালিক প্রবীর পুরকায়স্থ, ভাসা সিং, অভিসার শর্মা, অমিত চক্রবর্তী, বাপ্পা সিং ও সর্বোপরি পরাঞ্জয় গুহ ঠাকুরতাদের অফিস-বাড়িতে আচমকা হানা দিয়ে তাঁদের এ্যারেসট ও ব্যক্তিগত কাগজ পত্র তছনছ করে দিয়ে, এই দানবতন্ত্রের স্বরূপ আরও একবার উন্মোচিত করেছে। এই তথাকথিত রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত সাংবাদিককুলকে ইনটারোগেট করে বারবার একই প্রশ্ন করা হয়েছে তা' তীব্র মানসিক নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়।

তিস্তা শীতলবাদের 'ট্রাই কনটিনেন্টাল ইন্সটিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ' এর অফিসে হানা দিয়ে তছনছ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে গুজরাট জেনোসাইডের প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক নিঃশর্ত মুক্তি পাওয়ার পরদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিস্তা শীতলবাদ। প্রতিহিংসার রাজনীতি ভারতের জনগণের ভাগ্যাকাশে গভীর কালো মেঘের সঞ্চার করেছে। এই ভূতগ্রস্ততা আম্বানি ও আদানী সহ বিদেশী কর্পোরেট মুনাফাবাজদের অবদান। কেন-না, দেশের সমান্তরাল গভর্নমেন্ট তারাই। সংসদ ভবনের গদীতে যারা বসে আছেন তারা কেবলমাত্র আজ্ঞাবহ ছাড়া, আর কিছু নন। তবে এই সময়কালই কি 'অমৃত কাল'? না-কী কবির ভাষায় 'অমৃতই বিষ'! এই ঘোর অন্ধকারে যখন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও শাসকের দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন যেমন, 'মোদী আর কত করবেন? বিনা পয়সায় রেশনে পাঁচ কেজি চাল দিচ্ছেন'। কিন্তু রেশনের অধিকার যে ধাপে ধাপে বিলুপ্ত হয়ে করুণার দানে চলে গেল তাতে কোন হুঁশ নেই, তথাকথিত মূলধারার মিডিয়ার প্রচার ও কাজ করে বিপুল ভাবে।) সেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সামান্য কিছু সংবাদ মাধ্যমের মানুষেরা যে যৎকিঞ্চিৎ আলোকছটা বিকিরণ করছিলেন, তাঁদের কণ্ঠ ও লেখনী স্তব্ধ করে দেওয়া কি ফ্যাসিস্ট পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যাওয়া নয়?

অতি সম্প্রতি নতুন সংসদ ভবনে ৯২ জন সাংসদ কে সাসপেন্ড করে পাশ করিয়ে নেওয়া হল ন্যায়সংহিতা দন্ড বিল, উপরন্তু প্রস্তাবিত বিলটিতে আরও কঠোর ধারা সংযোজন করে বিরোধী শুন্য পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিবাদী জনতার মাথায় মুগুর ভাঙ্গার পাকাপাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল যা আগামী দিনে বিরোধী দলগুলিও ক্ষমতায় এলে ব্যাবহার করবেন না, এ-কথা গ্যারানটি দিয়ে বলা যায় না। যেমন কংগ্রেস তথা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং 'ডি এম এ্যাক্ট' প্রণয়ন করেছিলেন কিন্তু প্রয়োগ করেননি। এখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই দানবীয় বিল নির্বিচারে প্রয়োগ করছে এবং কংগ্রেস কর্তৃক সমালোচিত হলেও পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে,'এ-তো তোমাদেরই সৃষ্টি'।

আর টি আই বিলের আর কোন কার্য্যকারিতা বিশেষ নেই। সাধারণ মানুষ আর টি আই করে সদুত্তর পাননা সেক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে আর টি আই করে তথ্য জানতে চাওয়া নিতান্ত বাহুল্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এসবের পিছু-পিছু আসছে নয়া পোষ্টাল ও টেলি যোগাযোগ আইন। ডাক কর্মী সাধারণের চিঠি বা খাম খুলে এই কালা আইন মোতাবেক দেখতে পারবেন তথাকথিত আপত্তিকর কিছু লিখিত আছে কী-না এবং সন্দেহবশে তা' গোয়েন্দা বিভাগে প্রেরণ করতে পারবেন। মোবাইল ফোনে হোআটসএ্যাপের গোপনীয়তা একটি ভুয়ো সুরক্ষাব্যাবস্থা, কিন্তু সেই 'এণ্ড টু এণ্ড এনসক্রিপশন' এর তথাকথিত সুরক্ষাব্যাবস্থা শেষ হয়ে যাবে আরও নগ্নভাবে। ২০২৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর পাশ করা 'টেলিকমিউনিকেশন বিল' এর মর্ম বস্তু হোআটসএ্যাপ বাদ দিয়েও এক্স (পূর্বতন টুইটার), ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রামের মতো স্যোশাল মিডিয়াকেও বর্তমান সরকার বা শাসকদলটি কুক্ষিগত করতে চাইছে। তাহলে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষিত হবে কী করে! আদৌ রক্ষিত হবে কি?

প্রকৃত পক্ষে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে জনতার হাতে থাকবে পেন্সিল। সেন্ট্রাল ভিস্তায় নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্যাসিষ্টরা ক্ষমতায় এলেও নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত ও দূরীভূত করা যাবে না বলেই অনুমিত হয়। তার জন্য আপামর শোষিত, নিপীড়িত, সর্ব প্রকারে বঞ্চনা ও বিপুল বৈষম্যের শিকার জনতার গণমানসে তুমুল বিদ্রোহের তুফান উঠলে নাগপুরের নাগেরা পিছু হটবে।

১৮৭৮ সালে কৃষক বিদ্রোহে গণজাগরণ ও গণবিদ্রোহে ভীত লর্ড লিটন স্বাধীন সংবাদপত্র ও সাংবাদিককূলকে নিয়ন্ত্রণের দরুন 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি করেছিলেন। ১৯৭১ সালে ভারতের হস্তক্ষেপে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর বিরোধী দলনেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে 'মা দুর্গা' বলে

সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে শ্রীমতি গান্ধী লোকসভার সদস্যপদ হারাণ ও পরবর্তী ছয় বছর কোন নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। নিষেধাজ্ঞার এরূপ যুগান্তকারী রায়টিও ঘোষিত হয়। ঐতিহাসিক নকশালবাড়ির কৃষক ও চা শ্রমিকদের লড়াইয়ে ও খালিস্থান আন্দোলনে অসংখ্য যুবককে হত্যাকারী খুনী ও নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠনকারী সিদ্ধার্থ শংকর রায় শ্রীমতি গান্ধীকে এই কুপরামর্শ দিয়েছিলেন, তার ফলে সকল বিরোধী দলনেতা সহ কংগ্রেসের দুজন তরুণ তুর্কি চন্দ্রশেখর ও মোহন ধারিয়া জেলে গিয়েছিলেন। জেল যাত্রা করেছিলেন সাংবাদিক গৌর কিশোর ঘোষ ও জ্যোতির্ময় দত্ত ও কুলদীপ নায়ার।

আজ আমাদের দেশে আর জরুরি অবস্থা জারি না-করেই অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা খাদ্য, বস্ত্র স্বাস্থ্য, শিক্ষার ন্যায্য অধিকার কে গুঁড়িয়ে দিয়ে। সেন্ট্রাল ভিস্তায় ৮৮৮টি আসনে গোবলয় ও উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ আসনের জোরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদ এদেশে কায়েম হতে চলেছে। এই মানুষ মারা দর্শন, যা বিএস মুঞ্জে ১৯৩৬ সালে ইতালির বেনিতো মুসোলিনির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে এনেছিলেন। গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়েই মানবাধিকার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেই দর্শনকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সম্ভব।

লর্ড লিটন তথা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় শাসক চূড়ামণি আধা ফ্যাসিস্ট ইন্দিরা গান্ধী কালের গর্ভে, কালের আস্তাকুঁড়ে পতিত হয়েছেন। আজকের শাসকরাও একদিন জনতার রোষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন, সন্দেহ নেই।

'নিউজ ক্লিক' সংক্রান্ত তথ্য 'দ্য টেলিগ্রাফ' থেকে সংগৃহীত।

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে, উন্নয়নের পথে (মাথা চাড়া দেওয়া) অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞমন্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। যদিও এই রিপোর্ত জন-সমক্ষে আসেনি।

(পঞ্চম কিস্তি)

একদিকে জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রের অবদান (share) দ্রুতহারে কমছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা সেই

তুলনায় কমছে অনেক স্লথহারে—এই বেমানান চিত্র দেখাচ্ছে অর্থনীতির যে ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং জিডিপি অবদান অত্যন্ত দ্রুত হারে কমছে সেই কৃষি ক্ষেত্রেই নিযুক্ত মানুষের ঘনীভবনের পরিমাণ আপেক্ষিক ভাবে বেড়েই চলেছে।

কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত মানুষের দুর্দশা কোনও 'আপেক্ষিক ব্যাপার'। নয় তা চরম। কৃষি ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি একমাত্র বহু ফসলি জমি যেখানে আছে সেই রকম শ্রম ও সহ সহায়ক বাজার অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও লাগু করা যায়নি। তার ওপর বেশিরভাগ জায়গাতেই জমিতে খাটা বেশিরভাগ মানুষের, তাদের মধ্যে ছোট কৃষকও আছে, কোন নিয়োগকর্তা নেই। তারা স্বনিযুক্ত। তারা মজুরি শ্রমিক নয়। যারা নিজেরাই নিজেদের নিয়োগ করে সেখানে মিনিমাম ওয়েজেসের প্রশ্নই ওঠে না। আর তাদের জীবনযাত্রার মান-তো নির্ধারিত হবে গ্রামীণ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার অত্যন্ত ধীরগতি বৃদ্ধির হার দিয়ে।

দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৯৫-৯৬-এর মাঝামাঝি সময়ে হস্ত চালিত তাঁতের উৎপাদন প্রায় তেরো পার্সেন্ট (১৩ শতাংশ) এবং তাঁতের সংখ্যা প্রায় আট পার্সেন্ট(৮ শতাংশ) কমে গেছে। অথচ এই শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা যা ছিল (৬৫.৫ লক্ষ) তা প্রায় অপরিবর্তিত আছে ।

এতেই বোঝা যায় গরিব তাঁতীদের মাথাপিছু আয় কী মাত্রায় মার খেয়েছে যা অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে তাঁতীদের মধ্যে ব্যাপক আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। নির্মাণ শিল্পে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা এখন তিন কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনেরই ভাষায় এই ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ব্যাপক হারে শোষিত হওয়ার কারণ—তাদের নিরক্ষরতা ও সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা অবস্থা। তারা অদক্ষ, অসংগঠিত, তাদের কিছু জানানোও হয় না এবং সর্বোপরি তারা দরিদ্র।

উদারীকরণের প্রথম দশকে গ্রামাঞ্চলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে এবং শহরাঞ্চলে পুরুষদের ক্ষেত্রে বেকারির হার ধারাবাহিকভাবে একটানা ঊর্ধ্বমুখী

The National Commission for Enterprises in the Unorganised sector (অসংগঠিত ক্ষেত্রের উদ্যোগ সমূহ বিষয়ক জাতীয় কমিশন) Unorganised বা " informal" সেক্টর হিসেবে সেই সেই উদ্যোগগুলি কে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি এখনো 'নিগমবদ্ধ' নয়। সেগুলি ব্যক্তি মালিকানা বা

পারিবারিক মালিকানাধীন হতে পারে ।এবং সেখানে ১০ জন বা তার কম সংখ্যক মানুষ নিযুক্ত। তদুপরি এই কমিশন অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে তাদের চিহ্নিত করেছেন যারা এই সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত এবং এর পাশাপাশি যারা সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত হলেও তাদের নিয়োগ কর্তা তাদের সংগঠিত ক্ষেত্রের মত কাজের নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করে। কমিশনের হিসাবে সারাদেশে ৩৯.৭ কোটি মোট কর্মরত মানুষের মধ্যে ৩৪ কোটিই অসংগঠিত। যেহেতু বর্তমানে চালু শ্রম ও সহায়ক আইন গুলি (২০০৮ সালের কথা বলা হচ্ছে ২০২৪ নয়।) কী লিখিতভাবে কী বাস্তবে কোনভাবেই অসংগঠিত শিল্পে প্রবেশই করতে পারেনা এর অর্থ দাঁড়ায় দেশের মোট শ্রমিকের ৯০ শতাংশই আইনগুলি প্রদত্ত নিরাপত্তার সুযোগ পাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে।

দেখা যাক তৃতীয় জাতীয় কমিশনের চোখে চিহ্নিত অসংগঠিত ক্ষেত্রে উঠে আসা লক্ষণ গুলি কী কী—

নিম্নমাত্রার মজুরি/ নিম্ন মাত্রার আয়

নারী শ্রমিকদের উচ্চ মাত্রায় নিযুক্তি

গোটা পরিবারের শ্রমকে জুড়ে নেওয়া

শিশু শ্রমিক

ব্যাপক সংখ্যক, ব্যাপক সংখ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকের উপস্থিতি

ফুরন ভিত্তিক মজুরি

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও কাজের ধরন যেমন

মাঝে মাঝে কাজ পাওয়া, সারা বছর কাজ না থাকা, বাড়ি থেকে কাজ/কাজে বাড়িকেও ব্যবহার

ইউনিয়ন করার সুবিধা না থাকা

অস্থায়ী ধরনের আজ এ কাজ কাল ও কাজ

পুঁজির স্বল্পতা

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি খ.. ইত্যাদি

অসংগঠিত ক্ষেত্রে

নারী ও শিশুদের শুধু ব্যাপক হারে নিয়োগ করা হচ্ছে তাই নয়, তাদের অমানবিক চূড়ান্ত শোষণও সইতে হচ্ছে।

রাস্তায় দোকান পেতে বিক্রি করা বা হকারি করা স্বনিযুক্ত মানুষেরাই কোটি কোটি মানুষের মুখে রুটি তুলে দেবার ব্যবস্থা করে এবং এই ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে। অথচ পুলিশ এবং মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ এই পথ হকারদের ঝঞ্ঝাট ও কদর্যতা সৃষ্টিকারী হিসেবেই দেখতে ও দেখাতে অভ্যস্ত। আমাদের শহরগুলিকে পরিষ্কার রাখতে আবর্জনা কুড়ানী ও বাতিল ভাঙাচোরা জিনিসপত্র কিনে বেড়ানো মানুষেরও ভূমিকা কম নয় এবং তারাও নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই করে নেয়। অথচ এই জীবিকা গুলিকে দেখা হয় নোংরা ঘাটা অপরিচ্ছন্ন মানুষদের পেশা হিসেবে। মাছ ধরা যাদের জীবিকা, যারা সমুদ্রে যায়, দুর্ঘটনা-তো তাদের নিত্য সঙ্গী। তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বীমার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু বাইরে থেকে আসা ধীবররা এর বাইরেই থেকে যায় কারণ, এই বীমার আওতায় আসার জন্য এত কাগজপত্রের কাজ করতে হয় সেগুলো তাদের পক্ষে পেরে ওঠা সম্ভব হয় না।

Beedi and Cigar Workers Act নির্দিষ্ট একটি অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য গুলি মাথায় রেখে কিভাবে আইন তৈরি করা যায় তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কারণেই বিড়ি এবং সিগার শ্রমিক আইন তাদের যথেষ্ট কাজে লেগেছে। এইরকম উদাহরণ বিরল বললেই চলে। বরং আইন প্রণয়নের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট ধরনের দিকে নজর না দিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় কী করে একটা হৃষ্টপুষ্ট ওয়েলফেয়ার ফান্ড বানানো যায় এবং যার সাহায্যে অবসরকালীন জীবনে, মাতৃত্বের সময়ে, অসুখ বিসুখে ,কাজ বন্ধ থাকলেখ. টাকা দিয়ে কিছুটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়।

Displacement and Rehabilitation

(স্থানান্তরণ ও পুনর্বাসন)

স্থানান্তরণ আদতে নিজেও বাসভূমি ও চেনা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বল পূর্বক উচ্ছেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই স্থানান্তরণ তো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক সমস্যা বা সংকট। রাষ্ট্র নাগরিককে উচ্ছেদ করে। সামনে থাকে উন্নয়নের হরেক মুখ—বিশালতায় সেচ প্রকল্প

বৃহদাকার শিল্প স্থাপন

দানবাকার খনি খনন

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন

স্যাংচুয়ারি ও ন্যাশনাল পার্ক নির্মাণ

সুরক্ষা বাহিনীর গোলাগুলি চালানোর চাঁদমারিকেন্দ্র স্থাপন...

ইত্যাদি আরো হাজার হাজার ছোট বড় 'উন্নয়নের' জন্য মানুষকে ঠোঁটে যেতে হয় রাষ্ট্রের চাপে। উচ্ছেদ একটা অজস্র হাঁ-মুখের ভয়াবহ দানবের আতঙ্ক ছড়ায় যার প্রভাব বহু দুর ও বহু যুগ বিস্তৃত। কোন ক্ষতিপূরণ এই ক্ষতির পূরণ হয় না।

বিশালকায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মানুষকে ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্য পরিবেশে, অন্য জীবিকায়, এমনকি অন্য সংস্কৃতিতে।

এইসব স্বনিযুক্ত গরিব প্রান্তিক মানুষদের নির্মমভাবে ভিটেমাটি ছাড়া করা, জীবিকাচ্যুত করার আগে যদি সবদিক খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে এদের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার ব্যাপক পরিকল্পনা না-করা যায় তাহলে সেই কার্যক্রম ভয়াবহ অসন্তোষ উদ্গামের কারণ হবেই। এ ব্যাপারে সরকারের বিগত দিনের পদক্ষেপগুলি ন্যক্কাজনকভাবে হতাশা জনক। ফলে উচ্ছেদের খাড়া যাদের মাথায় ঝুলছে তারা তাদের ভবিষ্যতের দুর্দশা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ও সচেতন। সেই কারণে এস ই জেড সহ সমস্ত প্রজেক্টের কাজে হাত দেওয়ার অনেক আগেই নিরপেক্ষ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা উচিত। এবং উচ্ছেদ হতে যাওয়া পরিবারগুলির সদস্যদের দক্ষতা বাড়ানোর কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যা'তে তাদের উচ্ছেদ করে যে নতুন প্রজেক্টগুলি রূপায়িত হতে চলেছে সেখানে কাজ পাওয়ার দক্ষতা ও যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারে। এইরকম পদক্ষেপ কার্যকরী হলে উচ্ছেদের আতঙ্ক অনেক কমবে।

Labour, Unemployment, and wages
(শ্রমিক, বেকারত্ব ও মজুরি)

যদি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ হিসেবে জমি হারানো বা জমি না থাকাটাই এতাবৎকাল চিহ্নিত হয়ে থাকে, তবে বলতেই হবে বর্তমানে তীব্র বেকারি এবং জীবিকার অনিশ্চয়তাই, কী গ্রাম কী শহর সর্বত্র বিশেষতঃ যুব সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং ক্রোধের উৎস হিসেবে উঠে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়া নিয়ে মাতামাতি যথেষ্ট চললেও বেকারি কমার এমন কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, যাতে উৎসাহিত হওয়া যায়।

সামগ্রিক অর্থনীতির কাঠামোটি তিনটি বিষয় বা লক্ষণ থেকে উঠে আসে—

১) কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র এবং খনি ও খাদান থেকে আয় ছিল ১৯৫০-৫১ সালে মোট জিডিপি'র ৫৯ শতাংশ যা ১৯৯৯-২০০০ সালে হল ২৮ শতাংশ এবং তা' বর্তমানে (২০০৮) মাত্র'ই ১৮ শতাংশ

২) ম্যানুফাকচারিং এর ক্ষেত্রে আয় আবার ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১৩ শতাংশ। ১৯৯০-তে বেড়ে ২৪ শতাংশ হয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর, প্রায় দুই দশকে আর বাড়েনি।

এই ব্যবধানটা কমিয়ে দিচ্ছে বা অনেক টা পুরণ করে দিচ্ছে নিয়ত ক্রমবর্ধমান নতুন নতুন ক্ষেত্র (Tertiary) গুলি।

তা সত্ত্বেও কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ১৯৭০-এর ৭২ শতাংশ থেকে ১৯৯৯-২০০০-এ অর্থাৎ ত্রিশ বছরে হ্রাস পেয়েছে বটে, কিন্তু মাত্র ১০ শতাংশ কমে হয়েছিল ৬২ শতাংশ। আর আরও দশ বছর বাদে এখন (২০০৮) তা ৫৮ শতাংশ। *এরপর ২৮ পাতায়*

ডিপিডিপি'র (DPDP) জালে আর টি আই

অরিজিৎ গাঙ্গুলি

Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, ২০২৩ গত বছর ১১ই অগাস্ট থেকে লাগু করল কেন্দ্রীয় সরকার। এই নতুন আইনের দু'টি ধারার মাধ্যমে সরকার আরটিআই-এর দ্বারা জনগণের প্রাপ্ত অধিকার অনেকটাই ছেঁটে ফেলতে চায়।

আমরা জানি, ২০০৫ সালে আরটিআই আইন হবার পর অনেক ক্ষেত্রেই সরকারকে বেশ কিছু অস্বস্তিদায়ক তথ্য প্রকাশ্যে আনতে হয়েছে। গ্রামীণ রাজস্থানের মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠনের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে সরকার বাধ্য হয় আরটিআই আইন চালু করতে। গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের হাতে এটি এমন একটি অস্ত্র, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ দেশের শাসকের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ চাইতে পারে। এতেই ক্ষমতাসীন দলের অনীহা। জবাব দিতে তারা বাধ্য নয়। মনে রাখতে হবে জনগণের টাকায় দেশের শাসনকার্য চলে। ক'দিনের জন্য এমপি বা এমএলএ হয়ে দেশের নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় পৌঁছালেও, জনগণের টাকা বা দেশের সম্পদের অপচয় করার অধিকার তাদের নেই। শাসকের কোন কাজের হিসাব বুঝে নেওয়ার জন্য আরটিআই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আইন।

আরটিআই আইনের মাধ্যমে বহু সাধারণ মানুষ সরকারকে

বাধ্য করেছে অনেক অপ্রিয় প্রশ্নের জবাব দিতে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই সরকার জবাব দেয়নি বা এড়িয়ে গেছে। যেমন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কত মানুষ বা সংস্থা সাহায্য পেল তাদের বিশদ বিবরণ জানা যায়নি। জানা যায়নি, কতজন আইএএস অফিসারের বার্ষিক কাজের মূল্যায়ণের রিপোর্ট ১ বছর থেকে ৪ বছরের বেশী সময় ধরে আটকে আছে। আরও অনেক তথ্যই পাওয়া যায় নি। তবুও সরকার আইনের ধারা দেখিয়ে প্রশ্নগুলোকে বাতিলের তালিকায় ফেলতে পারেনি।

সরকারি কাজ স্বছন্দে সাবলীলভাবে করার জন্য, আরটিআই আইনের ৮ (১) ধারায় ১০টি ছাড় দেওয়া আছে। যা' দেখিয়ে সরকার কিছু ব্যক্তিগত তথ্য নাগরিককে নাও জানাতে পারে। আরটিআই আইনে বলা আছে, সংসদে বা বিধানসভায় যে তথ্য দেওয়া যাবে না, একমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই সরকার আবেদনকারিকে তথ্য না-জানাতে পারে। ৮ (১) ধারার শেষ উপধারায় বলা আছে, জনগণের কাজের/সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বা যেটা ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে বিপদে ফেলতে পারে একমাত্র এই দুই কারণে নাগরিককে তথ্য না দিতে পারে। এমন-কী নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আবেদনকারীকে তথ্য না দিলে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে এটাও জানিয়ে দিতে হবে যে, এই তথ্য সংসদেও পরিবেশন করা যাবে না। বোঝাই যায়, আরটিআই আইনে তথ্য গোপন করার অধিকার খুব সীমিত। তাই প্রয়োজন নতুন আইনের।

নতুন আইন DPDP এর ৪৪ (৩) ধারায় বলা হলো, কোন ব্যক্তিগত তথ্যই দেওয়া যাবে না। এই ধারা আরটিআই এর ৮ (১) এর শেষ উপধারাকে সংশোধন (অকার্যকরী) করে দিল। আগের বাধা আর রইলো না। এবার থেকে কোনও তথ্য সরকার দিতে না চাইলে, যে কোনও ভাবে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে আইনত সেটা না-দিতে পারে। এইভাবে তথ্য গোপন করার আইনি বৈধতা তৈরি করা হল, এই নতুন আইনে।

DPDP-এর ৩৮ (২) ধারায় বলা হল, এই নতুন আইন এতদিন এই বিষয়ে যা আইন ছিল তাকে বাতিল বা অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে। স্বাভাবিকভাবেই আরটিআই-এর আওতায় পড়ে গেল। এভাবেই সরকার তথ্য জানার অধিকারকে তথ্য না-জানানোর অধিকার দিয়ে চাপা দিলো।

অধিকার রক্ষার সংগঠন APDR এই বিষয়ে প্রতবাদের পথে চলতে চায়। আপনাদের সঙ্গে পেলে সরকার বাধ্য হবে হৃত অধিকার ফিরিয়ে দিতে।

তথ্যসূত্র:

*ভারতের প্রাক্তন তথ্য অধিকর্তা শৈলেশ গান্ধীর লেখার অনুসরণে। মূল লেখার লিঙ্ক নিচে রইলো।

https://www.downtoearth.org.in/news/governance/deliberate-omission-certain-provisions-in-digital-personal-data-protection-act-regression-for-democracy-91737

তথ্যানুসন্ধান

ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়কের পাশে দীর্ঘ দিন ধরে সরকারি জমিতে বসবাসকারী ৬টি পরিবারের বাড়িঘর ভেঙ্গে দেওয়ার তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

এপিডিআর গত মঙ্গলবার (০৬/১২/২৩) জানতে পারে ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়কের পাশে দীর্ঘ দিন ধরে সরকারি জমিতে বসবাসকারী ৬টি পরিবারের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পরের দু'দিন বাদ দিয়ে (০৯/১২/২৩) একটি তথ্যানুসন্ধানী দল ঐ এলাকায় তথ্যানুসন্ধান করে। একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন নিচে রাখা হল।

যা জানা গেছে চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়কের ফিডার রোড ও চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়কের রেল আন্ডারপাসের মধ্যবর্তী এলাকায় রাস্তার পাশে সরকারি জমিতে ৬টি দরিদ্র তপশীলী উপজাতি পরিবার (অধিকাংশের তপশীলী উপজাতি শংসাপত্র নেই) গত ৪০ বছর ধরে বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি পরিবারের সরকারি আবাস যোজনায় তৈরী বাড়ি ছিল। গত ০৮/১১/২৩ তারিখে পি ডাব্লিউ ডি (হুগলী সাব ডিভিশন ১) পুলিশি সহায়তায় ঐ ৬টি পরিবারের বাড়িঘর ভেঙে দেয়। তারপর থেকে ওই পরিবারগুলি খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছেন।

প্রেক্ষাপট চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়কের ২৮ কিমি পোষ্ট ও ২৯ কিমি পোষ্টের মধ্যে যে সরকারি জমিতে ঐ পরিবারগুলি

বসবাস করছে, তার পিছনে একটা নয়ানজুলির পরে একটি জমির (রুদ্রাণী মৌজার জে এল নং ১৮৯, খতিয়ান নং ৩৮১/১, এল আর ১৫২৪, আর এস ১২১০, থানা ধনিয়াখালি) মালিক শ্রী বৈদ্যনাথ মান্ডি। তিনি জমির একটি অংশ শ্রী কালিপদ মান্ডিকে বিক্রয় করে দেন। এর ফলে বৈদ্যনাথবাবুর বাকী অংশে চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়ক থেকে ঢোকা বেরোনোর রাস্তা থাকে না। বৈদ্যনাথবাবু জানতেন যে, কালিপদবাবুকে জমির অংশ বিক্রয় করলে বাকি অংশে চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়ক থেকে ঢোকা বেরোনোর রাস্তা থাকবে না। এই অবস্থায়, বৈদ্যনাথবাবু ২০১৮ সালে সরকারি জমিতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে তাঁর অবশিষ্ট জমিতে চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়ক থেকে ঢোকা বেরোনোর জন্য একটি রাস্তা ছেড়ে দিতে আনুরোধ করেন। সেইমতো ঐ পরিবারগুলি কমবেশি ৮ ফুটের একটি জমি রাস্তার জন্য ছেড়ে দেন। বৈদ্যনাথবাবু ঐ ছেড়ে দেওয়া জমিতে মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করে নেন। তথ্যানুসন্ধানী দলের অনুমান যে, পরে বৈদ্যনাথবাবু বুঝতে পারেন যে, জমির সামনে পরিবারগুলির বাড়ি-ঘরগুলি থাকলে তাঁর জমির সম্মুখভাগ অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। ফলে জমিটির বাণিজ্যিক মূল্য কমে যাবে। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা (WPA ৩৬৯৪ of ২০২০) করলেন যে জমির সামনে অবৈধ নির্মাণের জন্য তাঁর জমিতে ঢোকা-বেরোনোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তিনি পি ডাব্লিউ ডি (হুগলী সাব ডিভিশন ১)-এর কাছে একটি আবেদন করতে চান। মহামান্য আদালত এই আবেদন করার অনুমতি দিয়ে পি ডাব্লিউ ডি (হুগলী সাব ডিভিশন ১)-কে সমস্ত আক্রান্ত পক্ষের বক্তব্য শুনে আইন মাফিক ব্যবস্থা নিতে আদেশ দেন। পি ডাব্লিউ ডি (হুগলী সাব ডিভিশন ১) ওই ৬টি পরিবারকে শুনানির জন্য ডেকেছিল কী-না তার কোনও প্রমাণ তথ্যানুসন্ধানীরা পাননি। বৈদ্যনাথবাবুকে ২৫/১১/২১ তারিখে ডাকা হয়েছিল। এরপর, পি ডাব্লিউ ডি (হুগলী সাব ডিভিশন ১), সদর মহকুমা শাসকের আদালতে একটি উচ্ছেদের মামলা (case no. 3 of 2022 u/s 10 (3) of the West Bengal Highways Act,1964) করে এবং ২০/০৩/২৩ তারিখে সদর মহকুমা শাসক ঐ নির্দিষ্ট সরকারি জমি দখলমুক্ত করার আদেশ দেন। এমতাবস্থায়, ওই ৬টি পরিবার সদর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি মামলা (MP no. 297 of 2023 u/s 107 of Cr. P. C.) করে, যার ফলাফল তথ্যানুসন্ধানীরা জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, ০৮/১১/২৩ তারিখে বাড়িগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, পি ডাব্লিউ ডি (সড়ক)-এর সাথে কথা বলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা এখনও ফলপ্রসূ হয়নি।

পর্যবেক্ষণ পি ডাব্লিউ ডি (হুগলী সাব ডিভিশন ১) যে বাড়িগুলি ভেঙেছে ঠিক তার পাশেই সরকারি জমিতে নির্মাণ ছেড়ে রেখেছে। এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলে সরকারি জমিতে প্রচুর বাড়ি-ঘর এবং বাণিজ্যিক নির্মাণ রয়েছে। সড়কের প্রসারণ বা অন্য কোনও সরকারি প্রয়োজনে নয়, কেবলমাত্র বৈদ্যনাথ -বাবুর ব্যক্তিগত লাভের জন্য মাত্র ০.৫৭ শতক জমিতে বসবাসকারী হতদরিদ্র এই ৬টি পরিবারকে গৃহচ্যুত করা হয়েছে। বৈদ্যনাথবাবুর জমিতে ঢোকা বেরোনোর রাস্তা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন কোনও তদন্ত না-করে এই ৬টি পরিবারকে গৃহচ্যুত করেছে। সরকারি জমিতে সরকারি আবাস যোজনায় বাড়ি কী-ভাবে তৈরি হল সেটাও অনুসন্ধানের বিষয়।

দাবি

১) বৈদ্যনাথবাবুর জমিতে ঢোকা বেরোনোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই পরিবারগুলিকে আশ্রয়চ্যুত করার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে।

২) তদন্ত চলাকালীন এই পরিবারগুলির সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) অবিলম্বে এই পরিবারগুলিকে নিকটবর্তী খাস জমিতে পূনর্বাসন দিতে হবে।

৪) কে বা কারা বৈদ্যনাথবাবুর হয়ে এই পরিবারগুলিকে গৃহচ্যুত করেছে তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫) সরকারি জমিতে আবাস যোজনার বাড়ি কী-ভাবে তৈরী হল তার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুনশ্চঃ ২৮/১২/২০২৩ তারিখে পি ডাব্লিউ ডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে দেখা করে ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি সড়কের পাশে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমিতে বসবাসকারী ৬টি পরিবারের বাড়িঘর ভেঙ্গে দেওয়ার বিষয়ে বক্তব্য পেশ। কোর্টের কোনও সুনির্দিষ্ট আদেশ না থাকা সত্ত্বেও পি ডাব্লিউ ডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর বাধ্যবাধকতার যুক্তি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্যানুসন্ধানী দল : অমল রায়, কমল দত্ত, চৈতালী দাস, বাপী দাশগুপ্ত।

দার্জিলিং প্রস্তুতি কমিটির তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৩ ঘটে যাওয়া তিস্তা নদীর আচমকা বন্যা কবলিত পরিবারগুলির পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান সম্পন্ন হয়েছে। তথ্যানুসন্ধান ও তার ফলে উঠে আসা তথ্যাবলী নীচে দেওয়া হল।

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৩, শ্রীমতি অণুলতা গুরুং, অরুণ গাথানি, সুদান গুরুং, পূর্ণবালা থাপা, উমা প্রধান, নির্দেশ থাপা'র তত্ত্বাবধানে তথ্যানুসন্ধান হয় Banjey Najok, Gielle khola, Rangpo, Melli and tarkhola-তে। এবং ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৩ অণুলতা গুরুং, অরুণ গাথানি, দিলকুশ বমজন, উত্তমা সুনদাস, সক্কল দেওয়ান এর উপস্থিতিতে তিস্তা বাজারে তথ্যানুসন্ধান চলে।

উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে এবং স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে তথ্যানুসন্ধান টিমের উপলব্ধি—

১) গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০২৩ প্রশাসনিক সভায় প্রকাশ্যে উপযুক্ত পরিবার পিছু ৭৫০০০ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করলেও তিস্তা বাজার ও গরুরী বস্তির অন্তত আটটি প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এই অনুদান পায়নি। তারা অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেন এবং বলেন ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমনও অনেকের অনুদান মিলেছে। কিছু সরকারি অফিসার ও ভুয়া অনুদান প্রাপকদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু স্বার্থের গাঠছড়া বাঁধা আছে। নইলে যাদের অনুদান পাওয়ার কথা নয়, তারা অনুদান পায় কী করে?

২) ২৭ মাইলে তিস্তার ওপর বরাদ্দ প্রকল্প করার আগে নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষদের কোনরকম নোটিশ দেওয়া হয়নি। তৎকালীন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের কিছু নির্বাচিত কাউন্সিলরদের পরিচিত কিছু মানুষকে নিয়ে জনশুনানি করা হয়েছিল। NHPC কখনোই ঠিক মতো social impact assessment বা নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে প্রকৃত জনশুনানি করেই নি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানেই না বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের কী-কী ব্যবস্থা আছে বা সেগুলি পাওয়ার জন্য কী করতে হয়।

৩) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরাসরি NHPC-এর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসতে চায় যেখানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে GTA-কে রাখা যাবে না। তারা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বচ্ছতা দাবি করছেন।

৪) যেহেতু স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশিরভাগই দৈনিক মজুরি খাটা শ্রমজীবী এবং ছোট ব্যবসায়ী তাই তারা সরকার নির্দেশিত জায়গায় পুনর্বাসন চাইছেন না। কারণ সেখানে তাদের ব্যবসাও মার খাবে এবং দূর থেকে কাজের জায়গায় পৌঁছানোও সম্ভব হবে না।

৫) পাথর খোঁড়ার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং এখানকার অধিকাংশ লোক তাতে নিয়োজিত থাকায় পরিবারগুলির অবস্থা ভয়াবহ। তারা চাইছেন পরিবেশের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নদীর পাড়ে পাথর খোঁড়ার কাজ বজায় থাকুক।

৬) বসতি অঞ্চলে শক্ত করে পাড় বাঁধানো হোক যাতে ভবিষ্যতে এইরকম হড়পা বান এলেও তারা রক্ষা পেতে পারেন

আমরা বন্ধ চা বাগানগুলির অবস্থা নিয়ে আর একটি তথ্যানুসন্ধান করেছিলাম আমরা দেখলাম বাগান বন্ধ থাকলেও বেফাকের মানুষজনের ক্ষোভ নেই। কারণ অতীতে বারবার চা বাগান বন্ধ থাকায় তাদের অনেক দুর্দশা সইতে হয়েছে। এখন তারা পর্যটন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছে। পর্যটন ব্যবসা থেকে যারা আয় করছে তাদের এখন আর তেমন কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তবুও এখনও কিছু-কিছু পরিবার আছে যারা কেবল চা শিল্পের ওপরই নির্ভরশীল। কারণ, তাদের ট্যুরিজম ব্যবসায় লাগানোর জন্য এক ফোঁটা জমিও নেই। আবার চুম থুম (Choong Thoong) চা বাগানের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে পেট চালানোর জন্য তাদের বাধ্য হয়ে অন্যত্র পাড়ি দিতে হচ্ছে। জনস্বার্থে সরকারের অবিলম্বে চা বাগানগুলির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

রিপোর্ট

রিপোর্ট : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের 'কালো দিবস' ৬ ডিসেম্বর। ঐদিন ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়। কালিমালিপ্ত দিনটিকে স্মরণ করে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ, বিষবাষ্পকে দূর হঠাতে মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬ ডিসেম্বর সোনারপুর শাখা 'কালো দিবস' হিসেবে পথসভা করে। হিন্দুত্ববাদীরা ঐ সভা চলাকালীন হামলা করে।

প্রশাসনিক সহায়তায় তখনকার মতো বিষয়টি সামাল দেওয়া গেলেও ভবিষ্যতে এ বিষয়ে ভাবার আছে ।

সোনারপুর শাখার পথসভায় হিন্দুত্ববাদীদের হামলার প্রতিবাদে মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখা পোষ্টার লাগানো হয়।

৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ ডায়মন্ড হারবার শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রবীর হালদার এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় পাতড়া খেয়াঘাটে, ডায়মন্ড হারবারের শাখার উদ্যোগে।

২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন উপলক্ষে মানবাধিকার বিষয়ক পথসভা অনুষ্ঠিত হয় ডায়মন্ড হারবার এম বাজারের সামনে ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে।

রেললাইন থেকে সন্তোষপুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণের দাবিতে মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখা অঞ্চলে পোস্টার লাগানো হয়।

ইজরায়েল-প্যালেষ্টাইন নিয়ে গড়িয়া শাখা অঞ্চলে পোস্টার লাগানো হয়।

প্রতি শনিবার ও রবিবার জব্বারহাটের ব্যবসার জন্য এস এ ফারুকী রোড যানজট হয়। যানজট মুক্তর দাবিতে মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় থানা গুলোতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখার অন্তর্গত খালধাড়ি বুড়ির জলায় জলাশয় দখল করে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে শাখার উদ্যোগে গ্রামবাসীদের সহায়তায় অবৈধ নির্মাণ সরানোর ব্যবস্থা করা হয়।

রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় একটি কিশোরী মেয়েকে ইলোপ করার ঘটনায় শাখা থানায় যায়। ঘটনাটির কেস নিয়ে থানায় কথোপকথনের সময় আই সি মহঃ ফিরোজ আলি শাখার সদস্য আনসার আলিকে চড় মারে। এবং অন্যান্য সদস্যদের আটকে রাখে। এই নিয়ে শাখা এলাকায়পোস্টার লাগানো হয়। প্রতিবাদ সভা কর হয়।

মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখার কিলখানা মারি অঞ্চলে ওস্তাগর সাগর নামে এক কর্মচারীর টাকা আটকে রাখে এবং পরবর্তীকালে সাগরকে প্রচন্ড মারধর করে হত্যা করে। বর্তমানে সাগরের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

১লা জানুয়ারি, ২০২৪ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেটিয়াব্রুজ বড়তলা হাইস্কুলে। আয়োজক শাখা মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা। সম্মেলনে মনোনিত হন সভাপতি- তপতী চট্টোপাধ্যায়, কার্য্যকরি সভাপতি- দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক- শাহানারা খাতুন।

২০ ও ২১ জানুয়ারি সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি ও সুন্দরবনবাসীর জীবন-জীবিকা নিয়ে 'ডিঙ্গা ভাসাও' নামে সুন্দরবন শিল্প, সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব গুড়গুড়িয়া, ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের প্রজাঘেরিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জয়নগর-মৌপীঠ কোস্টাল শাখার উদ্যোগে এই উৎসব সংগঠিত হয়।

রিপোর্ট : মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা

২০২৩ সালের জুলাই খারাপ রাস্তা নিয়ে পোষ্টারিং করা হয়েছিল। তার ফলে, আংশিক সাফল্য এসেছে। মেটিয়াবুরুজে হাটের সময় যানজট নিয়ে নাদিয়াল থানা এবং ট্রাফিক পুলিশ কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্যা অনেকাংশে মিটেছে।

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ কারবালা পিঙ্ক স্কোয়ারে পথসভা হয়েছে। ৪ঠা ডিসেম্বর রবীন্দ্র নগর থানার বিরুদ্ধে শাখার তরফে যে কেস করা হয়েছিল তার শুনানি হয়েছে। রবীন্দ্র নগর থানায় ৪ ঠা জুলাই একটি ডেপুটেশনের সময় মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখার সদস্যদের যথেষ্ট হেনস্থা করে এবং শাখার এক সদস্যকে অকারণ চড় মারে আর ফোন কেড়ে নেয়। এমনকি অভিযোগকারীকেও মারধর করে। সেই ঘটনার জন্য শাখার পক্ষ থেকে আলিপুর কোর্টে মামলা করা হয়েছে।

১ লা জানুয়ারি, ২০২৪ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন মেটিয়াবুরুজে বটতলা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির ৯ টি শাখা অংশগ্রহণ করে আর ৫৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি- তপতী চট্টোপাধ্যায়, কার্য্যকরী সভাপতি- দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক- শাহনারা খাতুন মনোনিত হয়েছেন।

অত্যন্ত সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠান সফল হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে পোষ্টারিং করা হয়েছে।

রিপোর্ট : মালদা শাখা

আগামী ২-৩ মার্চ মালদা শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলা এপিডিআর এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে গত ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ এপিডিআর মালদা শাখার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ জন সদস্যের উপস্থিতিতে মালদায় অনুষ্ঠিত হতে চলা আগামী কেন্দ্রীয় সম্মেলনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ-বিষয়ে বিভিন্ন সদস্যরা তাদের মতামত রাখেন। আলোচনায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে সম্মেলন আয়োজন করার আকাঙ্ক্ষা উঠে আসে।

সম্মেলনে প্রতিনিধিদের থাকা, সম্মেলনের স্থান, অর্থ সংগ্রহ, কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরে ছয়টি উপ-সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই উপ-সমিতিগুলির নেতৃত্বের নাম ঠিক করা হয়। ঠিক হয়েছে আগামী ডিসেম্বরে সম্মেলন আয়োজন করার জন্য অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা আহ্বান করা হবে।

এই সভা থেকে ঠিক হয়, আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ রাজ হোটেল মোড়ে সন্ধ্যা ছয়'টায় প্রকাশ্য সভায় এপিডিআর মালদা শাখার পক্ষ থেকে দু'টি বই 'ভারতে ফ্যাসিবাদের গুরুজী' এবং 'জাতীয় শিক্ষানীতি কী ও কেন' প্রকাশ করা হবে। এই বই মুদ্রণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩-এর অনুষ্ঠান সফল করতে সকল সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ এর আহ্বান রাখা হয়।

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ মানবাধিকার দিবসে মালদা শহরের রাজ হোটেল মোড়ে এপিডিআর মালদা শাখার উদ্যোগে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ্য সময় ধরে চলা এই সভায় বিভিন্ন বক্তারা মানবাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস, আজকের দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় মালদা শাখার সম্পাদক প্রদীপ বাগচী, সহ সম্পাদক হাসনাথ সেখ, অধিকার আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা গৌতম চৌধুরী, অভিজিৎ ঘোষ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ এপিডিআর, মালদা শাখার কার্যালয়ে প্রকাশিত হল বর্ষীয়ান অধিকার আন্দোলন কর্মী ও প্রাক্তন শিক্ষক গৌতম চৌধুরী লিখিত 'ভারতে ফ্যাসিবাদের গুরুজী' শীর্ষক পুস্তিকাটি। আগামী ২-৩ মার্চ, ২০২৪, মালদা শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-এর ২৯ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সেই সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় বই প্রকাশ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। এপিডিআর মালদা শাখা সম্পাদক প্রদীপ বাগচীর প্রারম্ভিক বক্তব্যের পরেই বইটির লেখক, প্রকাশক এবং মুদ্রকের উপস্থিতিতে বইটি প্রকাশ করেন জেলার বিশিষ্ট শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক সোমশংকর সিনহা, বিশিষ্ট লেখক তৃপ্তি সাঁতরা, কবি প্রশান্ত গুহ মজুমদার। আজকের ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে এই বইটিতে।বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে সোম শংকর সিনহা ব্যাখ্যা করেন দেশের রাজনীতিতে পশ্চাদপদ ও মৌলবাদী চিন্তার ওপর ভিত্তি করে কিভাবে ফ্যাসিবাদের বিপদ বাড়ছে। স্বাধীনতার পরে সংবিধানকে শপথ করে যে বহুত্ববাদী ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। এর মতাদর্শগত চর্চা আজ জরুরী। সেই দিক থেকে এই বইটির প্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগ। এছাড়াও লেখিকা তৃপ্তি সাঁতরা, কবি প্রশান্ত গুহ মজুমদার, শিক্ষক অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, বামপন্থী নেতা গৌতম গুপ্ত, লেখক গৌতম চৌধুরী এই সভায় বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালক অরিন্দম বিশ্বাসের মনোজ্ঞ পরিবেশনে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

উক্ত সভা শেষে প্রবীণ সাংবাদিক মোঃ আতাউল্লাহ, সোমশংকর সিনহা, লেখিকা তৃপ্তি সাতরা, নদী ভাঙন আন্দোলনের প্রবীণ নেতা কেদার মন্ডল, প্রাক্তন শিক্ষক মহেশ্বর ভট্টাচার্য, সাংবাদিক মানস রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ বাগচীকে যৌথ আহ্বায়ক করে এপিডিআর এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন পরিচালনার জন্য একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়।

রিপোর্ট : দৌলাতাবাদ শাখা, মুর্শিদাবাদ

মানবাধিকার দিবস পালন করল এপিডিআর দৌলতাবাদ শাখা।

১০ই ডিসেম্বর, ২০২৩, মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ মোড়ে এলাকার সাধারণ মানুষকে নিয়ে 'মানবাধিকার দিবস' পালন করে এপিডিআর দৌলতাবাদ শাখার সদস্যরা। বক্তাদের আলোচনায় উঠে আসে মানবাধিকার সনদের কথা, উঠে আসে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিটি নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জ্বলন্ত চিত্রগুলি। উঠে আসে বর্তমানে ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিদ্বেষমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা, রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি ও কালা কানুন ইউএপিএ বাতিলের দাবিতে রুখে দাঁড়ানোর

কথা। দৌলতাবাদ শাখার সদস্যরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ, সভাপতি হামিদ সরকার, রাহুল চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।

রিপোর্ট : রাণীনগর শাখা, মুর্শিদাবাদ

১২ ই ডিসেম্বর, ২০২৩, 'মানবাধিকার দিবস-১০ ডিসেম্বর' উদযাপন করল এপিডিআর রানীনগর শাখা

রাণীনগর বাজারের মোড়ে পথসভার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো মানবাধিকার দিবস। এলাকার জনসাধারণের অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে উদ্দীপনা ছিল দেখবার মতো। ছোট-ছোট দোকানদার, সাধারণ কৃষক, এলাকার সম্মানীয় শিক্ষক ও ছাত্ররা। এপিডিআর-এর বক্তব্য শোনার জন্য বেশ ভালই ভিড় জমায়। এলাকার সাধারণ চাষীদের ওপর বিএসএফের অত্যাচার, সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশের যখন তখন দাদাগিরি, শাসক দলের অত্যাচার, এনআরসি বিরোধী সাধারণ মানুষের আন্দোলন, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থার অধিকারহীনতার বিশেষ দিকগুলি বক্তাদের আলোচনায় বেশ ভালোই উঠে আসে। রানীনগর শাখার সদস্যরা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি হামিদ সরকার, রাহুল চক্রবর্তী, সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ, সহ-সম্পাদক আব্দুল গনি বক্তব্য রাখেন।

রিপোর্ট : ডোমকল শাখা, মুর্শিদাবাদ

মানবাধিকার দিবসকে কেন্দ্র করে এপিডিআর ডোমকল শাখার পথসভা

২৩ শে ডিসেম্বর ২০২৩, ডোমকল শাখা, ব্রীজ মোড়ে একটি পথসভার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার দিবস উদযাপন করে। এই সভায় ডোমকল শাখার সদস্য ছাড়াও রানীনগর শাখা ও দৌলতাবাদ শাখা উপস্থিত ছিল।

বক্তাদের বক্তব্যে মূলত বিএসএফের দ্বারা সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের ওপর অত্যাচার, কর্পোরেটের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ঘেরা-টোপে দেশের জনসাধারণের জল, জঙ্গল, জমির অধিকার লুট, রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি সহ বিভিন্ন অধিকারহীনতা ও তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কথা উঠে আসে। বিশেষভাবে উঠে আসে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা। মার্কিন মদতে ইজরায়েলের প্যালেস্টাইনের ওপর বর্বর হামলার কথা। বক্তব্য রাখেন, ডোমকল শাখার সভাপতি মতিউর রহমান, সম্পাদক আব্দুল গণি, দৌলতাবাদ শাখার সভাপতি হামিদ সরকার, রাণীনগর শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য মকবুল হোসেন সহ আরও অনেকে।

ডোমকল থানার বেআইনিভাবে বাইক আরোহীকে হেনস্তা, মারধোর, টাকা দিতে বাধ্য করা ও হুমকির বিরুদ্ধে এপিডিআর ডোমকল শাখার গণঅবস্থান ও এসডিপিও, আইসি ডেপুটেশন

৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৩, মুকুল মন্ডল-কে মোটর বাইকের কাগজ দেখার নামে ডোমকল থানার এএসআই রবিউল আলম মির্জা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রচন্ড মারধর করে, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর হুমকি দেয়। এরপর মুকুল মন্ডল এপিডিআর ডোমকল শাখার সহযোগিতায় ডোমকল এসডিপিও ও মুর্শিদাবাদ জেলার এসপিকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানায় এবং ডোমকল থানার এএসআই রবিউল আলম মির্জার শাস্তি দাবী করে। এরপর ৬ ই জানুয়ারি, ২০২৪, ডোমকল শাখা এসডিও মোড়ে থানার সামনে ডোমকল থানার এএসআই রবিউল আলম মির্জার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর করা, সর্বসমক্ষে মুকুল মন্ডলের কাছে ক্ষমা চাওয়া, সাসপেন্ড করা ও চিকিৎসা বাবদ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে গণঅবস্থান শুরু করে।

এই অবস্থানে প্রায় ১০০ লোক জমায়েত হয়। এই জমায়েতে উল্লেখযোগ্যভাবে যুবক ও মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল দেখবার মত। অবস্থান চলাকালীন ডোমকলের প্রায় সমস্ত পোর্টাল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া হাজির হয়। অবস্থানে মুকুল মন্ডলের গোটা পরিবার হাজির ছিল। ক্লাস এইটে পড়া মুকুলের মেয়ে অবস্থান মঞ্চে আব্বুর ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে বক্তব্যও রাখে। অবস্থান চলাকালীনই অবস্থানমঞ্চ থেকে মুকুল ও মুকুলের পরিবার সহ প্রায় ১০ জন প্রতিনিধি সমেত পুলিশের ঘেরাটোপে ডোমকল থানার আইসিকে এপিডিআর ডোমকল শাখা ডেপুটেশন দেয়। এসডিপিও নিজে ডেপুটেশন না-নিয়ে আইসিকে নিতে বলেন। ডেপুটেশনে আইসি জানান ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না-পেলে, তিনি এফআইআর করবেন না। এপিডিআর ডোমকল শাখা তাঁর এই বক্তব্যকে অসাংবিধানিক বলে চিহ্নিত করে এবং আইসিকে জানায় সাত দিনের মধ্যে এফআইআর

করার পদক্ষেপ না-নেওয়া হলে সরাসরি কোর্টের মাধ্যমে পুলিশের বিরুদ্ধে কেস করবে। ডেপুটেশনের পর ডোমকল শাখা প্রেসকে তাদের বক্তব্য জানায়। প্রায় প্রতিটি মিডিয়াই ঘটনাটিকে সামনে নিয়ে আসে। সমস্ত ঘটনাটায় ডোমকল শাখার পদক্ষেপ এপিডিআরের পক্ষে একটা জনমত তৈরিতে ভালোই সাহায্য করে, বিশেষত যুবক ও মহিলাদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, বাইকের কাগজ দেখার নামে পুলিশের দ্বারা যুবকদের বেআইনিভাবে হেনস্থা শুধু ডোমকলেই হচ্ছে এমনটা নয়, আজ গোটা রাজ্য জুড়েই হচ্ছে। গোটা রাজ্যেই পুলিশের দাদাগিরি চলছে। পুলিশ হেফাজতে অত্যাচার ও হত্যার সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। গোটা রাজ্যটাই ক্রমশ পুলিশি রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। মেটিয়াবুরুজ শাখার সদস্যকেও পুলিশ কিছুদিন আগে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। মুকুল মন্ডলও এপিডিআর ডোমকল শাখার একজন সদস্য। ডোমকল থানা এখনও অভিযুক্ত এএসআই রবিউল আলম মির্জার বিরুদ্ধে এফআইআর করেনি। অপরদিকে ডোমকল শাখাও বিভিন্ন মানুষকে সাথে নিয়ে এর বিরুদ্ধে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নেওয়ার সাথে-সাথে পুলিশের বিরুদ্ধে কেস করার দিকে ক্রমশ এগোচ্ছে।

রিপোর্ট : বহরমপুর শাখা, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে একদিনে ১০ শিশুর মৃত্যু, পরের দিন আবারও ৪ শিশুর মৃত্যু

৯ই ডিসেম্বর ২০২৩ এপিডিআর বহরমপুর শাখার মেডিক্যাল কলেজ গেটে পোস্টার সহ নীরব প্রতিবাদ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশনসহ প্রেস কনফারেন্স

মুর্শিদাবাদ মেডিকাল কলেজে ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩, একদিনে ১০ শিশুর মৃত্যু। ৭ ই ডিসেম্বর অর্থাৎ পরের দিন আবারও ৪ শিশুর মৃত্যু! প্রথম ১০ শিশুকে জঙ্গিপুর সরকারি হাসপাতাল থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। শিশুদের মৃত্যুর পর জঙ্গিপুর সরকারি হাসপাতাল বা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের দায়সারা গোছের উত্তর মুর্শিদাবাদবাসীকে আশঙ্কিত করে তোলে। জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে বাচ্চাদেরকে রেফার করার আগে, তাদেরকে রেফার করার মত সুস্থ করে কেন পাঠানো হল না, এর কোনও প্রকৃত উত্তর দিতে পারেনি জঙ্গিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজেও সদ্যোজাত শিশুদের চিকিৎসার বিষয়ে এমন, কী গাফিলতি হচ্ছে, যার জন্য মানবাধিকার দিবসের প্রাক্কালে ১৪ শিশুর মৃত্যু হল! এরও কোনও স্পষ্ট উত্তর মুর্শিদাবাদবাসীর কাছে অধরা রয়ে গেছে।

স্বাস্থ্য জনসাধারণের অধিকার, কোনও ভিক্ষার দান নয়। বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারকে প্রতিনিয়ত মনে রাখার প্রয়োজন। অধিকারের বদলে স্বাস্থ্যকে সরকারের ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত করার পদক্ষেপকে ধিক্কার জানায় বহরমপুর শাখা।

নিম্নলিখিত দাবিগুলোকে সামনে রেখে এপিডিআর বহরমপুর শাখা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেয় ও হাসপাতাল চত্বরেই প্রকাশ্যে প্রেস কনফারেন্স করে।

১. স্বাস্থ্যকে অধিকারের বদলে ভিক্ষার ঝুলি হিসাবে জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসার মানসিকতাকে অবিলম্বে পরিবর্তন করুন।

২. চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা না-করে জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর হাসপাতালে অসুস্থ শিশুদের রেফার করা হল কেন?

৩. জঙ্গিপুর হাসপাতালে সংস্কারের কাজ শুরুর আগে অসুস্থ নবজাতক শিশুদের চিকিৎসার বিকল্প ব্যবস্থা কেন করা হল না। ভবিষ্যতের জন্য এখনই বিকল্প ব্যবস্থার কাজ শুরু করতে হবে।

৪. অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ জেলার চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যায় ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

স্বাস্থ্যের অধিকার জীবনের অধিকার

'মানবাধিকার দিবস, ১০ ডিসেম্বর' উদযাপন করে এপিডিআর বহরমপুর শাখা

স্বাস্থ্যের অধিকার, জীবনের অধিকার। একথা আমরা জানি। কিন্তু ট্রেনগুলিতে জীবনের অধিকারের সাথে স্বাস্থ্যের অধিকারের কোনও সম্পর্কই থাকেনা। মুর্শিদাবাদ থেকে শিয়ালদা ও কলকাতা স্টেশনগামী সমস্ত লোকাল ট্রেন, প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও এক্সপ্রেস ট্রেনে সাধারণ টিকিট কেটে হাজার হাজার অসুস্থ রোগীরা কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে যান। অনেক মহিলাই গর্ভবতী থাকেন, খারাপ অবস্থার রোগীরাও প্রচুর পরিমাণে থাকেন। বসার জায়গা পাওয়া-তো দুরস্থান, দাঁড়াবারও ঠিকঠাক জায়গা থাকে না। এই পাঁচ ঘন্টা জার্নির মধ্যে ট্রেনে কোনও ডাক্তার, কোনও মেডিক্যাল কম্পার্টমেন্ট,

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছুই থাকে না। ট্রেনে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেলে অবধারিত মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। এই হাজার হাজার সাধারণ মানুষরাই কিন্তু ট্রেনের বিশ্বস্ত প্যাসেঞ্জার।

বর্তমানে বহু ট্রেন বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ট্রেনগুলি সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের টাকায়, নানা শোভায় সজ্জিত সরকারি বন্দেভারত ট্রেনও দ্রুততার সাথে ছুটছে। অথচ ট্রেনের সব থেকে বিশ্বস্ত প্যাসেঞ্জার যে সাধারণ মানুষ, সেই ট্রেনের মধ্যে কোন চিকিৎসা ছাড়াই মৃত্যু পথযাত্রী হচ্ছে। ট্রেনগুলিতে রোগীদের সুস্থভাবে যাতায়াত করার জন্য ডাক্তারসহ একটি মেডিক্যাল কম্পার্টমেন্ট রাখার উপরই নির্ভর করবে এই সমস্যার সমাধান।

লালগোলা থেকে শিয়ালদা ও কলকাতা স্টেশনগামী প্রতিটি ট্রেনে রোগীদের জন্য ডাক্তার সহ একটি মেডিক্যাল কম্পার্টমেন্টের দাবিতে ১০ ই ডিসেম্বর প্রতিবাদ সভা করে ও মিছিল করে বহরমপুর স্টেশনে নিম্নলিখিত দাবিতে গণডেপুটেশন দেয় বহরমপুর শাখা।

১. অবিলম্বে লালগোলা থেকে শিয়ালদা বা কলকাতা স্টেশনগামী সমস্ত ট্রেনে রোগীদের জন্য ডাক্তার সহ একটি মেডিকাল কম্পার্টমেন্ট রাখতে হবে।

২. ওই কম্পার্টমেন্টে সাধারণ টিকিট কেটে যেসব রোগীরা যাতায়াত করেন, তারাই শুধুমাত্র উঠবেন। ট্রেনে যাতায়াত করার সময় রোগীদের প্রাথমিক সমস্ত চিকিৎসার দায় ও দায়িত্ব থাকবে রেলের। প্রতি মেডিকেল কম্পার্টমেন্টে একজন ডাক্তার অতি অবশ্যই থাকবে।

বহরমপুরের সঞ্চারিকা ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভা ও মিছিলটিতে বহরমপুর শাখার সদস্য ছাড়াও শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মী, টোটো চালকসহ কান্দি ও রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখার সদস্যরা ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম মোহাম্মদ আজাদ উপস্থিত ছিল।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

রিপোর্ট : মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি

রামের নামে মসজিদ ভাঙ্গা, মন্দির গড়া

ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিদ্বেষমূলক রাজনীতি ছড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভা চলাকালীন বিজেপি, আরএসএস ও পুলিশের যৌথ হামলা

২০ শে জানুয়ারি, ২০২৪, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিদ্বেষ-মুলক রাজনীতির বিরুদ্ধে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির একটি সভা ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিলের কর্মসূচি চলছিল। বিজেপি'র বহরমপুর যুব মোর্চার নেতৃত্বে একটি যুব-বাহিনী সভা চলাকালীন এসে গুন্ডামি শুরু করে। অপ্রাসঙ্গিক ও অবাঞ্ছিত কথা বলে চেঁচামেচি শুরু করে। পুলিশ যেন ওদের দাবি মতই চারিদিক থেকে সভাকে ঘিরে নেয় এবং সভা বন্ধ করতে বাধ্য করে। এই সভা ও মাইক ব্যবহারসহ মিছিলের বিষয় বহরমপুর থানাতে আগে থেকেই লিখিত আকারে জানানো ছিল। তা-সত্ত্বেও কতিপয় গুন্ডা বাহিনীর চাপে নতি শিকার করে পুলিশ ৫১ বছরের পুরনো একটি মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠনের সভা বন্ধ করে দিল। এই সভা বন্ধ করে দেওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সমস্ত সদস্যরা ওখান থেকে চলে আসে। তারপর গঙ্গাজল, দুধ ও ধূপকাঠি দিয়ে টেক্সটাইল কলেজ মোড়কে অর্থাৎ এপিডিআরের সভার স্থলকে পুলিশের উপস্থিতিতেই 'শুদ্ধ' করে বিজেপি, আরএসএস এর গুন্ডাবাহিনী, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে মনে করিয়ে দেয়।

এই ঘটনাটি থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির অনুধাবন

১. নূন্যতম গণতান্ত্রিক পরিসর আজকের কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি দল ও আরএসএস রাখেনি। রামের নামে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা ও রাম মন্দির গড়া নিয়ে সমাজে যে ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিদ্বেষ মূলক রাজনীতি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার বিরোধিতায় নূনতম গণতান্ত্রিক সভা করাও বর্তমানে এই বিজেপি, আরএসএসের সময়ে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এই ধরনের গণতান্ত্রিক সভা বন্ধ করতে সব ধরণের রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে।

২. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও কার্যত বিজেপির এই অপশাসনের বিরুদ্ধে লোক দেখানো এক মৌখিক বিরোধিতা করছে। কলকাতায় শাসক দলের নেতাকে সামনে রেখে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিটিং, মিছিল হচ্ছে, আর জেলাগুলিতে,

মফস্বলে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরকে দমন করার জন্য পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে। সব থেকে ভয়ংকর দিক এটাই। পুলিশকে লিখিত আকারে জানানো সত্বেও ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিদ্বেষ বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক সভাকে চলতে দিল না বহরমপুর থানা। ফোর্স নিয়ে এসে বলপূর্বক বন্ধ করে দিল। যারা আক্রান্ত হল, তাদের সভাকে বন্ধ করে দিয়ে, যারা আক্রমণ করল, পুলিশ তাদের পক্ষ নিল। রাজ্য সরকারের এই দ্বি-চারি ভূমিকাটা ক্রমশ সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

৩. বর্তমানে যে, একটি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশকে চালানো হচ্ছে, সেটা ক্রমশই সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর এটি যে শুধু বিজেপি আরএসএস করছে তা নয়, তাদের লাগানো আগুনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পুলিশও হাত সেঁকছে। শুধুমাত্র ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিসর কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এটাই নয়, ধর্মীয় মেরুকরণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে, বিশেষত ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন মতাবলম্বী গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল জনসাধারণকে এক মধ্যযুগীয় অসম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। সভাস্থলটিকে গঙ্গাজল, দুধ ও ধূপকাঠি দিয়ে 'শুদ্ধ' করার যে চেতনা, আসলে এটা হল এক ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বরতা, ঘৃণা ও অসম্মান প্রদর্শন। আর এই অসম্মান শুধুমাত্র এপিডিআরের সদস্যদের জন্যই নয়, সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের প্রতি। হিন্দু ফ্যাসিবাদ কায়েমের লক্ষ্যে মানুষকে অসম্মান করার এই মধ্যযুগীয় প্রথার এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি তীব্রভাবে ধিক্কার জানাচ্ছে। সাথে সাথে সমস্ত গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

উক্ত সমস্ত বিষয়গুলি মানুষের কাছে নিয়ে আসার জন্য ২১শে জানুয়ারি ২০২৪ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বহরমপুরে একটি প্রেস কনফারেন্স করে। প্রেস বিবৃতিও প্রকাশ করে। প্রেস কনফারেন্সে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার উপস্থিতি ভালই ছিল। এনআরসি বিরোধী সংহতির নেত্রী, বন্দিমুক্তি কমিটির রাজ্য সহ-সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ স্বাধিকার মঞ্চের সভাপতি এই প্রেস কনফারেন্সে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাথে ছিল। তারা সকলেই ঘটনাটিকে ধিক্কার জানায়। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, খুবই দ্রুত ওই একই জায়গাতে একটি বড় সভা ও শহরের মধ্যে ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিদ্বেষ মূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি মিছিল করবে।

রিপোর্ট : বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী শাখা, হুগলী

ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া শাখা'র দ্বাদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে, ২৭ জানুয়ারী, ২০২৪ শনিবার। সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মনোনীত হয়েছেন, সভাপতি- সত্যনারায়ণ পাল, সহ সভাপতি- স্বপন সেনগুপ্ত এবং অশোক রায়, সম্পাদক- তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ- বৈদ্যনাথ নাথ। পর্যবেক্ষক ছিলেন, অরিজিৎ গাঙ্গুলি।

রিপোর্ট : শ্রীরামপুর শাখা, হুগলী

শ্রীরামপুর শাখা'র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, শনিবার। সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মনোনীত হয়েছেন, সভাপতি- অরূপ দাস, সম্পাদক- সুকুমার তেওয়ারী, কোষাধ্যক্ষ- শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী। পর্যবেক্ষক ছিলেন, জয়দেব দাস।

রিপোর্ট : চুঁচুড়া শাখা, হুগলী

চুঁচুড়া শাখা'র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, রবিবার। সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মনোনীত হয়েছেন, সভাপতি- দেবাশীষ গুপ্ত, সহ-সভাপতি- কল্যাণ সেন এবং স্বপন মাতব্বর, সম্পাদক- চৈতালী দাস। পর্যবেক্ষক ছিলেন, বাপী দাস গুপ্ত।

রিপোর্ট : কেন্দ্রীয় কর্ম্মসুচি

বিশ্বে নয়া উদার অর্থনীতির পক্ষে, আর এস এস এর হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য সফল করা ও অনৈতিক ভাবে সংবিধানে ব্যাপক বদল করে প্রতিবাদীদের জেলে আটক করে কেন্দ্রের শাসকদল সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে যেসব নীতি অবলম্বন করছে, তাতে রাজ্যের সরকারের ইন্ধনে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে এপিডিআর যথাসম্ভব প্রতিবাদ ও জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে।

মানুষের সাংবিধানিক অধিকার অগ্রাহ্য করে কেন্দ্র ও রাজ্য

যেসব বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে নীতি প্রণয়ন করছে তার প্রতিবাদে ২৩ নভেম্বর, ২০২৩, বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র সামনে সকাল দশটা থেকে সারাদিন অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সারা রাজ্যের বিভিন্ন শাখার সদস্যরা অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতিবাদী বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মীরা ব্যাপক হারে সংগঠিত হয়ে মিছিল করে এই সভায় যোগ দেন। কিছু গণসংগঠনের কর্মীরাও এই অবস্থানের সমর্থনে তাদের বক্তব্য রাখেন।

২৮ নভেম্বর, ২০২৩, পুঁজিপতিদের স্বার্থে প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংসকারী অবৈজ্ঞানিক যোশীমঠের ক্ষ্মচারধামক্ষ্ম প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অবহেলায় শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার বিরুদ্ধে কলেজস্ট্রীট কফি হাউসের সামনে একটা বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। সেই সভায় সংগঠনের বিভিন্ন বক্তা ছাড়াও প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত সংগঠন এর পক্ষে কিছু ব্যক্তি এই প্রকল্পের ভয়াবহ পরিণতি বিষয়ে জনগণের কাছে বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

৩০ নভেম্বর, ২০২৩, কপিল ভট্টাচার্য স্মরণে যে বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়েছিল তা বক্তার অসুস্থতার কারণে বাতিল করতে বাধ্য হয় সংগঠন। ১০ ডিসেম্বর ২০২৩, 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালিত হয় বরাহনগর ডানলপ মোড়ে। এই সভা সর্বাত্মক ভাবে সফল করতে বহু সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। গান কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে এই দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। বিভিন্ন বক্তা রাষ্ট্রের দ্বারা মানবাধিকার হরণের দিকগুলো চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সোচ্চার হতে আবেদন জানান। সভার ক্ষেত্রটি নতুন হলেও সভায় জনসমাগম উল্লেখযোগ্য।

২২ ডিসেম্বর, ২০২৩, ত্রিপুরা হিতসাধনী হলে এপিডিআর এর শুভানুধ্যায়ী ও গণ আন্দোলনের পক্ষে লেখক, সাহিত্যকার, কবি ও প্রবন্ধকার শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে স্মরণসভার আয়োজন করে। শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু ও বিভিন্ন সহকর্মীরা স্মৃতিচারণ করেন। এ ছাড়াও ঐ সভায় তাঁর পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ৪-৬ জানুয়ারি ২০২৪ কলেজ স্কোয়ারে আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলায় অংশগ্রহণ করে সংগঠনের প্রকাশিত বিভিন্ন বই নিয়ে।

১৭ জানুয়ারি ২০২৪ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হাজরা মোড়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। অবিলম্বে রাজনৈতিক কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি ওঠে এই সভায়। দন্ড সংহিতা নামে প্রচলিত আইনকে আরও কঠোর করে প্রতিবাদীদের আটক করা, বনাধিকার আইন অগ্রাহ্য করে জল জমি জঙ্গল লুঠ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের পক্ষে কথা বলা সাংবাদিকদের হয়রানি বন্ধের দাবি ছিল এই সভার মুখ্য বিষয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই সভায় বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা।

১৮-৩১ জানুয়ারি ২০২৪ আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় প্রতিবারের মতো এবারও অংশগ্রহণ করে এপিডিআর। এপিডিআর এর বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র-কে নির্দেশ করে ফ্লেক্স ব্যানার পোস্টারে সাজানো হয় স্টলটিকে। বহু সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই স্টল। বিভিন্ন শাখার সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় মেলায় অংশগ্রহণ সফল হয়। এইবারের বইমেলায় গিল্ডের ও পুলিশের নিন্দনীয় ভূমিকা, প্রতিবাদী সংগঠনের সদস্যদের ওপর পুলিশি নির্যাতন ও বইমেলার ব্যবসায়ীক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করে এপিডিআর।

রিপোর্ট : সোনারপুর শাখা

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR), সোনারপুর শাখার আহ্বানে প্যালেস্টাইনবাসীর উপর দখলদার রাষ্ট্র ইজরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিল ও পথসভা।

৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে হামাস গোষ্ঠীকে খতম করার নামে প্যালেস্টাইনের গাজা এবং ওয়েস্টব্যাঙ্কে আকাশপথে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স। এর মধ্যে ১০০০০ শিশু। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা ধরলে মোট মৃতের সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যার ৭০ শতাংশই মহিলা ও শিশু। গত ১০০ দিনের প্রতি ১৫ মিনিটে ১ জন প্যালেস্টাইনীয় শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। ১৭ লক্ষ গাজাবাসীর বাসস্থান ধ্বংস করে তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। গাজা-র হাসপাতালগুলি দখল নিয়ে সেখানকার বিদ্যুৎসংযোগ ও অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে অসুস্থ শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে ইজরায়েলি সেনারা। এই ঘৃণ্য গণহত্যার ছবি যাতে সারা বিশ্বের কাছে না পৌঁছয়, সেই লক্ষ্যে প্রায় ৬০ জন সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীকেও হত্যা করেছে ইজরায়েল।

দক্ষিণ গাজার কয়েকটি বাদে সমস্ত হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইজরায়েল। বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী হত্যা করা হয়েছে যাতে আহত প্যালেস্টাইনবাসীদের বিনা-চিকিৎসায় হত্যা করা যায়। আমেরিকা, ব্রিটেন, ইত্যাদি শক্তির মদতেই মিথ্যা আত্মরক্ষা-র নামে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী ইজরায়েল এই হত্যালীলা চালিয়েছে।

দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে গাজাকে অবরুদ্ধ করে সেখানে শিশুখাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর জোগান বন্ধ করে অধিকাংশ শিশুকেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল ইজরায়েল রাষ্ট্র। এই ঘৃণ্য গণহত্যার বিরুদ্ধে গত ২৭ নভেম্বর, ২০২৩, এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখা এক প্রতিবাদী মিছিল ও গণজমায়েতের ডাক দিয়েছিল। ঐদিন বিকেল ৪টে মিছিল শুরু হয় সোনারপুর স্টেশন চত্বর-অটো স্ট্যান্ড থেকে। মিছিলের শুরুতে সোনারপুরে বক্তব্য রাখেন এ পি ডি আর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর, এ পি ডি আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শঙ্কর দাস, এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখার সম্পাদক জগদীশ সরদার, এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখার সভাপতি গালিব ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সোনারপুর স্টেশন চত্বর থেকে মিছিল শুরু হয়ে এগোতে থেকে কামালাগাজী মোড়ের দিকে। মিশনপল্লী মোড়ের কাছে মিছিল সাময়িকভাবে বিরতি নেয়, সেখানে আর-একটি জনসভা হয়। বক্তব্য রাখেন এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার অন্যতম সদস্য আনিসুর রহমান, এ পি ডি আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শঙ্কর দাস, এ পি ডি আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য, এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার অন্যতম সদস্য সুজয় ভদ্র (তিনি প্রয়াত হয়েছেন গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩) ও অন্যান্যরা। মিছিল আবার এগোতে থাকে কামালগাজীর দিকে। মিছিল থেকে বিলি করা হয় এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার প্রচারপত্র। মিছিল ও পথসভাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যায়। বহু মানুষ এগিয়ে এসে প্রচারপত্র সংগ্রহ করে আমাদের সমর্থন জানিয়ে যান। কামালগাজী মোড়ে মিছিল শেষ হলে সেখানে পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন এ পি ডি আর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর, এ পি ডি আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শঙ্কর দাস, এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখার সম্পাদক জগদীশ সরদার, এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখার সভাপতি গালিব ইসলাম, এ পি ডি আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য, এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার অন্যতম সদস্য সুজয় ভদ্র এবং আনিসুর রহমান। পথসভাকে ঘিরে পথচলতি সাধারণ মানুষের যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আমাদের গণমিছিল ও পথসভা থেকে দাবি ওঠে—

১. প্যালেস্টাইনে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মদতে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের গণহত্যা ও অন্যায্য দখলদারি বন্ধ হোক।

২. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে গণহত্যাকারী-শিশুঘাতী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নরঘাতক বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর মদতদাতাদের বিচার করে তাঁদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

৩. রাষ্ট্রসংঘকে ঘোষণা করতে হবে যে ইজরায়েল একটি অবৈধ দখলদার রাষ্ট্র। এই অবৈধ দখলদারির বিলোপসাধন করে প্যালেস্টাইনের পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ভারতীয় জনগণের টাকায় গণহত্যাকারী-শিশুঘাতী ইজরায়েলের থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করা চলবে না।

৫. ভারত সরকারকে গণহত্যাকারী-শিশুঘাতী ইজরায়েল রাষ্ট্রকে অবৈধ ঘোষণা করে তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে প্যালেস্টাইনের পূর্ণ স্বাধীনতাকে মান্যতা দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনও অবৈধ দখলদারি শক্তি আত্মরক্ষার অজুহাতে কোনও জনগোষ্ঠীর ওপর সামরিক আক্রমণ চালাতে পারে না। ইজরায়েল হল অবৈধ ঔপনিবেশিক শক্তি, আর প্যালেস্টাইন হল পরাধীন জাতিরাষ্ট্র। প্যালেস্টাইন লড়ছে মুক্তির লড়াই, আর ইজরায়েল চালাচ্ছে বেআইনি দখলদারি। কিন্তু ইজরায়েল এই গণহত্যা এখনও বন্ধ করেনি, তাই আগামী দিনে এইরকম আরও প্রতিবাদী কর্মসূচী গ্রহণে এ পি ডি আর সোনারপুর শাখা অঙ্গীকারবদ্ধ।

৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কালা দিবসে গেরুয়া বর্বরতাকে ধিক্কার জানাতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR), সোনারপুর শাখার পথসভা,

৬ ডিসেম্বর ২০২৩ দিনটিকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR), সোনারপুর শাখা একটি কালাদিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তকরসেবকদ নামধারী আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মোন্মাদ গেরুয়া বাহিনী ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ। বাবরি ধ্বংসের পর সারা দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ভয়াবহ দাঙ্গা আর সংখ্যালঘু নিধন ঘটায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংস্বেবক সংঘের হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পে বাবরি ধ্বংস ছিল অন্যতম পদক্ষেপ। এরপর গত ৩১ বছরে মুম্বই-গুজরাত-

দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সহ সারা দেশে দাঙ্গা আর সংখ্যালঘু নিধনের ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেগুলি সবই ছিল আর এস এস তথা বিজেপি'র হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। ২০১৪ সালে পূর্ণ সংখ্যগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী, আমিত শাহ নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণের কাজ আরও তীব্রতর হয়েছে। তাই আমরা ৬ ডিসেম্বর দিনটিকে কালাদিবস হিসেবে স্মরণে রেখে সোনারপুর ষ্টেশন ও বাস ষ্ট্যান্ড সংলগ্ন মোড়ে একটি প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন হয়েছিল। সন্ধ্যা ৬টার সময় পথসভা শুরু হয়।

সভার প্রথম বক্তা মোর্তজা হোসেন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ' নামধারী একদল হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতি হাতে হনুমানের ছবি দেওয়া পতাকা নিয়ে 'জয় শ্রীরাম' ও অন্যান্য কয়েকটি সংখ্যালঘু-বিদ্বেষী হুঙ্কার দিতে-দিতে সভাস্থলের কাছে এগিয়ে আসে। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছিল তারা আমাদের সভার ওপর হামলা চালিয়ে সভাটি বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এগিয়ে আসছিল। সেখানে উপস্থিত পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতায় তারা আমাদের উপর আক্রমণ শানাতে পারেনি। আমাদের অকুতোভয় APDR কর্মীরা সভাকে ঘিরে ছিলেন। আমরা সভা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করিনি। বক্তারা তাঁদের বক্তব্য চালিয়ে গেছেন। সভায় বক্তব্য রাখেন এ পি ডি আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শঙ্কর দাস, এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখার সম্পাদক জগদীশ সরদার, এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখার সভাপতি গালিব ইসলাম, এ পি ডি আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য, এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার অন্যতম সদস্য সুজয় ভদ্র এবং আনিসুর রহমান।

এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভার উপর ধর্মোন্মাদ গেরুয়া বাহিনীর কাপুরুষোচিত হামলার প্রচেষ্টাকে তীব্র ধিক্কার জানাই। এই ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কী-ভাবে হিন্দুত্ববাদের পাণ্ডা সংঘ পরিবার ও তাদের চেলাচামুণ্ডাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেই নেমে আসে রামরাজ্যের গেস্টাপো বাহিনীর রাজদণ্ড! আমরা উপলব্ধি করেছি যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের অধিকারের ওপর এই স্বৈরাচারী দমনপীড়নের বিরুদ্ধে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, গণতন্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন ও ব্যক্তিদের আরও বেশি করে সংগঠিতভাবে পথে নামা প্রয়োজন। মৌলবাদীদের এই হামলার ছক অবশ্য আমাদের মনোবল আরও বাড়িয়ে দিল। হিন্দুত্বের বা যে-কোনও স্বৈরাচারী রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই আমাদের আগামীদিনের কর্মসূচী চালিয়ে যাব।

---

১৬ পাতার পর

সাধারণ সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার চলে যাচ্ছে সাধারণের নাগালের বাইরে। (Common Property Resources)

Common Property Resources (CPR) বা সাধারণ সম্পত্তি উৎস গুলি গ্রামীণ অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক স্থানীয় মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন হিসাবে গণ্য হয়। CPR এর অন্তর্ভুক্ত উৎস গুলি হল বিস্তীর্ণ প্রান্তর, জল, উদ্ভিদ সম্পদ, চারণ ক্ষেত্র, নিকাশি জলাভূমি, সাধারণের আবর্জনা ফেলার জায়গা, গ্রামের পুকুর, নদী, নালা এবং সীমাহীন জলাভূমি অঞ্চল.... সবকিছু। ধনীদের তুলনায় গরিব মানুষদের অনেক বেশি এইসব সাধারণ সম্পদ উৎসের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কারণ তাদের আয়ের উৎস দুর্বল, বিশেষ করে মরা সময়গুলিতে যখন চাষের কাজ বন্ধ থাকে তখন কাজ জোটানো বা ক্রয় ক্ষমতা, দুটোই কমে যায় সেই সময় সাধারণ সম্পদ উৎস গুলির ওপর তাদের নির্ভরতা অনেক বেশি বেড়ে যায়। সেই কারণে এই উৎস গুলি শুকিয়ে না যাওয়া এবং সেগুলি ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হওয়া—দুইই বিপন্ন মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উপনিবেশিক কাল থেকেই এই সাধারণ সম্পদ উৎস গুলি ব্যাপকভাবে কমে আসছে। কেন? রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এগুলির উপর রাষ্ট্রের দখলদারি, শিল্পায়ন, বেসরকারি করণএবং উন্নয়নের ধাক্কা—এসবই এর কারণ। সরকারের জমি বন্টন নীতির ওপর ভর করে প্রাইভেট ফার্ম গুলি জমি কেড়ে নেওয়া ও নিজেদের বেড়ার সীমাকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলা—চালিয়েই যাচ্ছে। জনসাধারণের ভোগ্য সম্পদ ও সম্পত্তিগুলি থেকেও প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে সরকারের এই নীতির কারণে CPR ভূমিকেও স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনে লাগানো হবে এই প্রয়োজনীয়তা ভুলে গিয়ে মুনাফার উৎস হিসেবে দেখতে ও দেখাতে চাইছে। কারণ এই বিস্তীর্ণ পড়ে থাকা ভূখণ্ডের দিকে এখন স্থানীয় মানুষের চোখ দিয়ে নয়, বাজারের চাহিদা পূরণের চোখ দিয়ে তাকানো হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা স্থানীয় মানুষের তদারকি ও দেখভাল কথার অবসান ঘটিয়ে এই মাঠ প্রান্তর জলাচারণ ক্ষেত্রের ওপর বসাচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান গুলির

শেষাংশ ২ পাতায়